নেবুমামার
স্বর্গ-দর্শন

নেবুমামার স্বর্গ-দর্শন

বিমল কর

বুলবুল ও মুনমুনকে
প্রীতি-উপহার

ঃ কোন পাতায় কোন গল্প

নেবুমামার
স্বর্গ-দর্শন

আমি আমার নেবুবাগানের মামার বড় ভক্ত। বাড়িতে আমরা তাকে নেবুমামা বলি। নেবুমামা যে রীতিমত প্রতিভা, এ-কথাটা শুধু আমি বা আমরাই বুঝলাম, আর কেউ বুঝল না—এর জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়। নেবুমামার দোষ বলতে তিনি আফিম খান, পনের-বিশ বছর ধরে একনাগাড়ে ওই জিনিসটা খেয়ে আসছেন। তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল? আফিং তো কত লোকই খায়, তাই বলে কি তারা নেবুমামার মতন মৌতাতে বুঁদ হয়ে অমন মজার মজার সৃষ্টি ছাড়া গল্প বলতে পারে? মামা আমার পুরুষ্টু জামের মতন আফিংয়ের একটি ডেলা মুখে পুরে দেন সন্ধের আগেই। সন্ধেও যত জমতে লাগে, মামার আফিংয়ের নেশাও তত জমে ওঠে। আরও খানিকটা পরে মামা একেবারে বুঁদ। ঠিক এই সময়টায় মামার কাছে গিয়ে বসলেই বোঝা যায় মামা কত বড় প্রতিভা।

সেদিন সময় বুঝে মামার কাছে যেতেই ঢুলুঢুলু চোখ তুলে মামা জিজ্ঞেস করলেন, "কে রে?"

"আমি গজু।"

"গজু! আয় বোস।"

খাটের ওপর মোটা বিছানায় মামা আধশোয়া হয়ে বসে, তার চারপাশে গণ্ডা দেড়েক নানান সাইজের তাকিয়া, বালিশের একধারে হাড়ের পিঠচুলকুনিটা পড়ে আছে, চশমার খাপে ডজন খানেক পালক কান চুলকাবার একটা ছোট টিপয়ের ওপর খাবার গ্লাস, তাতে মিছরি ভেজানো জল, আর মামার সেই আদ্যিকালের পকেট ঘড়ি।

চেয়ার টেনে মামার মুখোমুখি বসে বললাম, 'কেমন আছেন?'

'কেমন আর, ভালই আছি। কাল তো স্বর্গেই ঘুরে এলাম।'

'স্বর্গ?'

'স্বর্গ ছাড়া আর কী! তোদের ইন্দ্রটিন্দ্র কত দেব-দেবীকেই দেখলাম। জায়গাটা খারাপ নয়, বুঝলি গজু, আজকাল স্বর্গও উন্নতি করেছে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সাইন্সে মাষ্টার।'

নেবুমামার কাছে গল্প শুনতে হলে বোকার মতন হাসতে নেই, গাধার মতন যা তা জিজ্ঞেস করতে নেই। আমি ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'ব্যাপারটা কি বলুন তো!'

মামা পিঠচুলকুনি দিয়ে পায়ের দিকটা একটু চুলকে নিলেন, তারপর

বললেন, 'কাল বিকেলের দিকে একটু মানিকতলা বাজারে গিয়েছিলুম, বুঝলি। তোর মামী আজকাল যেমন ফাঁকিবাজ হয়েছে, তেমনি কিপ্টে; আগের মতন আর দুধ জাল দিয়ে ক্ষীর করতে পারে না, পাড়ার দোকান থেকে যা রাবড়ি আনায় তাতে তোর যতো ব্লটিং পেপার আর প্লাষ্টিকের টুকরো। অখাদ্য যতো সব। তা মাণিকতলা বাজারের কাছে নগেন ময়রার দোকান, রাবড়িতে মাষ্টার, আমার সঙ্গে খাতিরও আছে।...তা হলো কী জানিস, রাবড়ি কিনতে গিয়ে একেবারে ঠিক শেতলা মন্দিরের কাছে মিনিবাস চাপা পড়লুম। কোত্থেকে একটা মিনিবাস গাঁক গাঁক করে ছুটে এসে মারল ধাক্কা, আমিও দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে খতম।'

'খতম?'

'ডেফিনিটলি খতম। এ তো তোর সাইকেলে চাপা পড়া নয়, একে বলে মিনিবাস। একবার ঘাড়ে চাপল, ব্যাস ইহকাল ফিনিশ।'

'মিনিবাসের ফিনিশটা ভালই। তারপর কী হল বলুন?'

মামা তাকিয়া অদল-বদল করে বসলেন। বললেন, 'আমি তো মরে রাস্তায় পড়েই থাকলাম চিৎপাত হয়ে যখন একটু একটু ফিকে জ্ঞানের মতন হচ্ছে তখন মনে হল, আমায় কারা যেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ভাবলুম, তাহলে মরে যাইনি, থোড়া জ্যান্ত আছি, অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি বোধ হয় হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। খানিকটা পরে সে ভুল ভাঙল। তোদের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি মানে ছ্যাকড়া গাড়ি, গাড়ির মধ্যে দেড় হাজার ইঁদুর মরার গন্ধ, কিন্তু এ কোন গাড়িতে চেপে যাচ্ছি, যেমন নরম তুলোর মতন ফোম বিছানা, সেই রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গাড়ি, ইউক্যালিপটাসের গন্ধের মতন একটা গন্ধ বাতাসে, কোনো রকম শব্দ হচ্ছে না, শুধু আমার মাথার ওপর টিপের মতন একটা ছোট্ট সবুজ বাতি জ্বলছে। তোদের কলকাতার রাস্তাঘাট দিয়ে গেলেই যত রাজ্যের ঠেলা-ঠেলি, হইহই-রইরই, ট্রামের ঘড়ঘড়, রোককে, বাঁধকের কান ফাটা শব্দ। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, এই যে যাচ্ছি—কোনো শব্দ নেই, শান্ত সব, আলোটালোর রেখাও আসছে না। তা হলে যাচ্ছি কোথায়? কাউকে যে জিজ্ঞেস করব তার উপায় নেই আমি একলা। হঠাৎ আমার কেমন শীত শীত করতে লাগল। তোকে বলব কী গজু। যেই না শীত শীত করতে লাগল অমনি দেখি আমার মাথার ওপরকার সেই সবজে ছোট্ট বাতিটা নিবে গিয়ে লাল বাতি জ্বলে উঠল। আর একটু পরেই কোত্থেকে গরম বাতাস

এসে যেন ঢুকতে লাগল। দেখতে দেখতে আমার শীত গেল কেটে, বাতিটাও টুক করে নিবে গেল। বড় আজব কাণ্ড।'

'গাড়িটা নিশ্চয়ই আমেরিকান মামা, ওরা শুনেছি সব ব্যাপারেই ভেলকি দেখায়।'

নেবুমামা ধমকের মতন করে বললেন, 'যা যা বেটা, আমেরিকান দেখাস না! ওঁদের স্বর্গটা কোথায়? নিউইয়র্কের মাথার ওপর? আমাদের স্বর্গ হিমালয়ে, পজিশনটা ধর কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছাকাছি কোথাও। আরও উঁচুতে। ...সেই আশ্চর্য্য জিনিসই তো দেখলাম রে গজু। যেই না স্বর্গে—আমার গাড়ি থামল, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। জনা চারেক ছেলে—একেবারে যেন দেবদূত—কী চেহারা। কী ড্রেস—আমায় ষ্ট্রেচার সমেত বাইরে বের করে সঙ্গে সঙ্গে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফেলল। ব্যাপারটা তুই বুঝলি না, এ এক রকমের ঢাকনা, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সেই ঢাকনার মধ্যে, শুধু মুখের দিকটায় ফাঁক। আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। চাঁদের ফুটফুটে আলো চারপাশে কত রকমের সুন্দর সুন্দর গাছ, রাশি রাশি ফুল, মেঘের টুকরো ভেসে যাচ্ছে কুয়াশার মতন। বিউটিফুল। ওই রাস্তা দিয়ে সামান্য এগিয়েই সেই লোকগুলো আমায় একটা কনভেয়ার বেল্টে শুইয়ে দিল। কনভেয়ার বেল্ট বুঝলি?'

'দেখেছি কোথায় যেন।'

'যেমন দেখেছিস, সে রকম নয়, এ একেবারে চারপাশ ফাকা, হালকা আলো জ্বলছে, গরম বাতাস চালু রয়েছে ভেতরে, মস্ত বড় বেল্টের মধ্যে আমায় শুইয়ে দিল ...বেল্টটা ফিতের মতন খুলেই যাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে, আগে আগে আরও কতজন শোয়ানো, আমি নদীর জলে ভেলার মতন ভেসে চললাম।...তারপর চক্ষের পলকে যথাস্থানে।'

'যথাস্থানে মানে?'

'যথাস্থানে মানে তোর স্বর্গের মেইন্ গেট্। যুধিষ্ঠিরকে বোধ হয় ওই দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়েছিল। অবশ্য তখন দিনকাল আলাদা ছিল, এখনকার মতো মডার্ণ-স্বর্গ তো সৃষ্টি হয়নি। এখনি একেবারে অন্য ব্যাপার, শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে লোক আসছে, কাকে কোথায় পাঠাবে, কিসে ক'রে পাঠাবে তার একটা এলাহি ব্যবস্থা না থাকলে কি হয়! ব্যাপারটা তুই বুঝতে পারবি না, তবু একটা আইডিয়া যাতে করতে পারিস সেজন্যে বলছি—আমাদের

দমদম এয়ারপোর্টের টারমিন্যাল বিল্ডিংয়ের কথা ভাব। অনেকটা ওই রকম। ঝকঝক করছে চারিদিক সোফাসেটিতে ভরতি, মোটা মোটা কার্পেট, বিশাল লাউঞ্জ, স্বর্গের কর্মচারীরা আকাশ নীল ইউনিফর্ম পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, টু শব্দটি করার জো নেই, যার যা প্রয়োজন সঙ্গে সঙ্গে মিটে যাচ্ছে, মাইকে চাপা গলায় বলে দিচ্ছে কাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।…আমায় তেরো নম্বর সাইড ফটকে নিয়ে যেতে বলল।'

'আমি বললাম, মামা, তেরো কেন?'

নেবুমামা বললেন, তেরো হল অ্যাকসিডেণ্ট কেসের ফটক। আসলে স্বর্গের মেইন গেট এখন চারটে নর্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েষ্ট, প্রত্যেকটা বড় ফটকের ভিতরে আবার বার-তেরোটি করে ছোট ফটক। এক একটা ছোট ফটক এক এক ধরণের কেসের জন্যে। ধর আমি যদি হার্টের রোগে মরতাম, আমায় হয়ত সাউথ মেইন দিয়ে তিন নম্বর গেটে যেতে হত, কলেরায় মরলে সাত নম্বর। এই রকম আর কী!'

'বাঃ, সিস্টেমটা ভাল।'

'ভাল বলে ভাল, অসাধারণ, দেখেশুনে শিখে নেবার মতন।'

'তারপর কী হল?'

'তারপর তেরো নম্বরেই যেতেই দেখলাম, সেখানে স্বয়ং তখন চিত্রগুপ্ত হাজির। চিত্রগুপ্ত কে জানিস? যমরাজের বারোজন সাকরেদের একজন; সবচেয়ে পেয়ারের লোক। ভদ্রলোক রাতের টহল মারতে এসেছিলে পাজামা আর গুরু পাঞ্জাবী পরে। আমায় দেখেই ভুরু কুঁচকে উঠল। ততক্ষণে আমার গায়ের ওপরকার সেই ঢাকনা স্বর্গের লোকেরা খুলে দিয়েছে। চিত্রগুপ্ত একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কেস?' সে বলল, 'অ্যাকসিডেণ্ট কেস স্যার।' চিত্রগুপ্ত আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসে মরেছ?' আমি খুব বিনীত গলায় চিঁ চিঁ করে বললাম, 'মিনিবাস চাপা পড়ে প্রভু।' চিত্রগুপ্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কলকাতায় নিশ্চয়?' আজ্ঞে হ্যাঁ…।' চিত্রগুপ্ত টেবিলে বসা একজন কেরাণীকে বললেন, 'নাম ঠিকানা টুকে নিয়ে একে মিনি ওয়ার্কশপে পাঠিয়ে দাও। আর কাল সকালে যানবাহন দপ্তরের বড় কর্তাকে একটা ডেসি অফিসিয়াল দিয়ে দিও, বলো এভাবে রোজ গুচ্ছের করে লোক পাঠালে আমরা পারব না। কী ভেবেছে ওরা? ওদের জন্যে নতুন একটা ওয়ার্কশপ খুলতে হল, চব্বিশ ঘন্টা সেখানে কাজ হচ্ছে আমরা কি নিঃশ্বাস

ফেলতেও পারব না ? এই বলে চিত্রগুপ্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গেলেন।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'নেবুমামা, দারুণ দিয়েছ! চিত্রগুপ্তকে দেখতে ইচ্ছা করছে।'

নেবুমামা এবার একটু জল খেলেন। মিছরি ভেজানো জল। পালক নিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে আরামে চোখ দুটো আরও বুজে ফেললেন। তারপর বললেন, 'আমায় তো তারপর এক জায়গায় নিয়ে গেল। দেখি হঁ্যা হয়ে গেলুম, বুঝলি গজু। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ব্যাপারটা বুঝলাম। ওটা হল মিনি কারখানা, মানে মিনিবাসে চাপা পড়ে যারা মরছে সব ওখানে হাজির হচ্ছে। কারখানায় ছোট বড় হাজার রকম মিস্ত্রী, সবাই ব্যস্ত, আলোয় আলো হয়ে আছে চতুর্দিক, অসংখ্য যন্ত্রপাতি—করাত, হাতুড়ি, রেঞ্চ প্লায়ার, তুরপুন, চিসেল, নানান সাইজের নাট বল্টু, কব্জা; সেদ মেশিনের মতন আধ ডজন মেসিন, আরও কত কী! দেখলে ভিরমি লেগে যায়। আমি যাওয়া মাত্র টেবিলে তুলে ফেলল। ফেলেই এক বোতল সঞ্জীবনী প্লাজমা ইনট্রাভেনাস দিতে শুরু করল, পটাপট ইনজেকশান মেরে দিলে পেটে, কুকুরের রোগ হতে পারে, স্বর্গের দেবতারা মর্তের কুকুর আর জলাতঙ্কের ভয়ে মরে। যুধিষ্ঠিরের টাইম থেকেই বোধ হয়। তা বাবা বলতে কি, ইনজেকশানটা কিসের জানি না, শরীরটা একেবারে জ্ঞান-অজ্ঞানের মাঝামাঝি জায়গায় শূন্য বিন্দুতে থাকল। সবই দেখতে পাচ্ছিলাম বুঝতে পারছিলাম—কিন্তু বলতে পারছিলাম না। কোনো কষ্টই আর কষ্ট নয়।···তারপর বুঝলি গজু, ওরা করল কী প্রথমেই আমার মাথা কামিয়ে ওপরের খুলিটা ফেলে দিল। ওই জায়গাতেই আমার লেগেছিল কিনা, হাড়গুলো ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছিল। ওরা যখন আমার মাথা নিয়ে ব্যস্ত তখন আমি ওদের কথাবার্তা সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। একজন বললে আমার ঘিলু নষ্ট হয়ে গেছে; রক্তও জমে রয়েছে মাথার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কে একজন জল-মেশিন নিয়ে এল, এনেই স্প্রে করতে লাগল, জমা রক্ত ধুয়ে সাফ, তারপর কিসের একটা ওষুধ লাগিয়ে দিল। ওখানে ওদের ঘিলু দেবার যন্তরও আছে। পেট্রল পাম্পে গাড়ি টাড়ি ধোয়ানোর সময় যেভাবে গ্রিজ দেয় কলকজায়, অনেকটা সেইভাবে অটোমেটিক মেশিন দিয়ে ফট্ ফট্ করে ঘিলু ভরে দেয়। আমার ব্রেনেও ঘিলু ভরে দিল। ভাবলাম বলি, স্যার, আর একটু বেশী করে দিয়ে দিন, নতুন করে পাচ্ছি যখন, তু চামচে

বেশী ঘিলু পেলেই ভালই হয়। কিন্তু বলা হল না, কথা বলতে পারছিলাম না যে। শেষে একটা নতুন খুলি আমার মাথায় ফিট করে দিয়ে স্ক্রু মেরে দিল। দিয়ে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে মাথার ব্যাপারটা শেষ করল। তারপর ডান পা…'

'ডান পায়ে আবার কী হয়েছিল মামা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ডান পায়ের গোড়ালির দিকটা চেপ্টে গিয়েছিল।'

'কী সর্বনাশ!'

'সর্বনাশের কিছু নেই। তোদের এখনি সব ব্যাপারেই সর্বনাশ, স্বর্গে সর্বনাশ বলে কিছু নেই। খুব ইজি ব্যাপার দেখলাম। আমার টেবিলের পাশে চাকা ঘুরিয়ে আমায় উঠিয়ে বসিয়ে দিল, দিয়ে একটা কাচের পাম্প মেশিন আনল, তার মধ্যে রক্ত-টক্ত মেশানো একরকম জিনিস আছে। গাড়ির চাকায় হাওয়া করার মতন চ্যাপ্টা পায়ে ভরে দিল। বাঁ পায়ের সঙ্গে মিশিয়ে ডান পা রেডি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আসলে জানিস গজু, আমার ডান পায়ে একটু গোদ মতন ছিল। বেটারা তো তা জানে না। আমিও বললাম না। ফলে আমার দুটো পা একই রকম হয়ে গেল। বেটাদের খুব ঠকিয়েছি…,' নেবুমামা ফিকফিক করে হাসতে লাগলেন।

'সামান্য অপেক্ষা করে আমি বললাম, 'মামা তারপর কী হল?'

মামা বললেন, 'তারপর আমায় আরও দু-তিনটে ইনজেকশান ঠুকে দিল, দিয়ে রেস্টরুমে নিয়ে যেতে বলল। রেস্টরুমটা খানিকটা দূরে, কারখানা থেকে বেরিয়ে আধ মাইলটাক যেতে হয়। স্বর্গে একরকম স্কুটার ট্যাকসি হয়েছে, তাতে করে আমায় রেষ্টরুমে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে দেখলাম লরি, স্টেটবাস, প্রাইভেট বাস, ট্রেন এইসব চাপা পড়ে অক্কা পাওয়া লোক ওদের জন্যে সব আলাদা আলাদা কারখানা। কারখানার মাথায় নিওন লাইটে লেখা আছে— 'লরি', 'ষ্টেটবাস' এইসব। তবে যাই হোক, স্বর্গের ওয়েদারটা কাল খুব ভাল ছিল। জ্যোৎস্না, পাতলা পাতলা মেঘ, গাছ-গাছালির গন্ধ, ফুলের সুবাস— চমৎকার লাগছিল। রেস্টরুমে এসে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।'

আমি হাসি চেপে বসে থাকলাম। মনে হচ্ছে মামার গল্প এখনও শেষ হয়নি। ধৈর্য ধরে বসে থাকতেই হবে, উপায় কী!

সামান্য পরে নেবুমামা বললেন, 'পরের দিনই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল, বুঝলি গজু?'

'কী রকম?'

'পরের দিন সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বেড-টি খেলাম। রোদ টোদ উঠে স্বর্গ একেবারে ওয়াণ্ডারফুল। একটু বেলায় ব্রেকফাষ্ট করলুম। শরীরে কোন যন্ত্রণা নেই, কষ্ট নেই, শুধু একটু দুর্বল লাগছিল। ভাবলাম একটু বাগানে পায়চারি করি। সামনের বাগানে পায়চারি করতে করতে দেখলুম, আমাদের এখানে গভর্ণর যেভাবে যান, তার চেয়েও শ'গুণ বেশী রাজকীয় সমারোহে ইন্দ্র তার স্পেশাল গাড়িতে করে রাস্তা দিয়ে চলে গেলেন। একজন বলল দেবরাজ অফিসে যাচ্ছেন। সবাই হাত জোড় করে নমস্কার করছিল, আমিও করলাম। তারপর গেলেন বরুণ-টরুণ। কৃষ্ণকে দেখলাম না। উনি বোধ হয় অফিস-টফিস যান না, বাড়িতে বসে বসে তাসপাশা খেলেন। ইন্দ্রের স্ত্রী সচীদেবী হুড্‌খোলা গাড়ি হাকিয়ে বোধ হয় বাজারে কিংবা মনিং শোয়ে সিনেমা দেখতে গেলেন। লক্ষ্মীকেও দেখলাম; মুখ ভার করে কোথায় যেন গেলেন।··· এই সব দেখতে দেখতে বেলা হয়ে গেল। স্নান খাওয়ার কথা ভাবছি; এমন সময় দেখি, দাড়িআলা ফতুয়া গায়ে এক বুড়ো বাগান দিয়ে আসছে। লোক-টাকে কেমন কেমন চেনা চেনা মনে হল, কোথায় যেন দেখেছি। মাথায় চুড়ো করে চুল বাঁধা, ফতুয়ার ওপর একটা চাদর ঝুলছে, পায়ে হাওয়াই চটি। মুখটি এমনিতে বেশ হাসি হাসি কিন্তু চোখের চাউনি শার্লক হোমসের মতন। বুড়ো গিয়ে বারান্দায় উঠতে না উঠতেই আমাদের রেস্টরুমের ম্যানেজার অশ্বিনীদুলাল ছুটতে ছুটতে তার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। দুজনে কী কথা হল শুনতে পেলাম না। খানিকক্ষণ দুজনেই গুজুর গুজুর করল, তারপর সেই বুড়ো তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দেখতে লাগল। শেষে আঙুল দিয়ে আমায় দেখাল। অশ্বিনীদুলাল আমায় ডাকলেন। কাছে যেতেই বুড়োর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি দেবর্ষি নারদ।'··· নারদ শুনেই আমি জিব কেটে ফেললাম। ছি ছি, এই মানুষটিকে আমি চিনতে পারিনি? ছেলেবেলা থেকে কত ছবি দেখলাম, কত বায়োস্কোপ দেখলাম—আর কাজের বেলাতেই ভুল। করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে বললাম, 'প্রভু আমার ভুল হয়েছিল—আমায় ক্ষমা করুন।' দেবর্ষি আশীর্বাদ করে বললেন, 'মানুষের ভুল হয় কিন্তু তুমি বাবা এখন তো মানুষ নও, স্বর্গবাসী, আর তোমার ভুল হবে না।' ফট করে মূর্খের মতন জিজ্ঞেস করলাম, দেবর্ষি, আমি কি তবে দেবতা? নারদ আমার কথা শুনে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে হেসে বললেন, 'না বাবা, তুমি দেবতা নও। দেবতারা দেবলোকেই জন্মায়।

তুমি মানুষ, দেবলোকে এসেছ, এখানে তোমার জায়গা আছে, থাকতে পারবে। তবে স্বর্গও ক্রমে তোমাদের কলকাতা শহরের মতন থিকথি পপুলেটেড্, আমাদের বড় জায়গার অভাব, শীঘ্র আর একটা জায়গায় শহর বসাব—মানুষদের জন্যে।'

আমি হাসছিলাম। নেবুমামাও হাসলেন। হাসতে হাসতে মিছরি ভেজানো জল আরও খানিকটা খেয়ে আরাম করে বসলেন।

নেবুমামা বললেন, 'নারদমুনি যে কত ফিচেল একটু পরেই বুঝলাম। আমার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এখন তুমি কেমন আছ?' ভালই ছিলাম—বললাম. 'একটু দুর্বল দুর্বল লাগছে, নয়তো চমৎকার—আছি।' উনি মিট মিট করে হেসে বললেন. 'তা তো থাকবেই। যে ধকল গেল শরীরের ওপর দিয়ে—তারপর এতটা পথ আসা। তবে কিছু ভেবোনা, বিকেলের দিকে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখন স্নান খাওয়া সেরে দুটো তুলসী বড়ি খেয়ে নাও। শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। কিন্তু বাবা, তোমায় যে একটু উপকার করতে হবে।' বললাম,—'বলুন নিশ্চয় করব. আমি তো আপনাদের দাস।'···মুনি খুব অমায়িক হাসি হেসে বললেন, 'আমাদের এখানে স্কুলে একটা পরীক্ষা চলছে। শীতকালে ঠাণ্ডার জন্যে স্বর্গে স্কুল কলেজ সব বন্ধ আছে, এই গরমেই আমাদের অ্যানুয়েল পরীক্ষা। তা বাবা, স্বর্গের মাষ্টাররা দুদিন ধরে ষ্ট্রাইক করে বসে আছে। আজ কালকার ছেলেছোকরা মাষ্টার বড্ড তেজী, ওদিকে আমাদের সরস্বতী ঠাকরুনও তেজী কম নয়। হুকুম দিয়েছেন—পরীক্ষা হবেই। আমার ওপর ভার পড়েছে কিছু আনকোরা লোক ধরে নিয়ে গিয়ে স্কুলে বসিয়ে দিতে।···

তোমায় কিস্যুটি করতে হবে না, শুধু গিয়ে চেয়ারে বসে থাকবে, গার্ড দেবে বুঝলে, আমি দেখলুম এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ, আমি আনকোরা লোক, চব্বিশ ঘণ্টাও স্বর্গে আসিনি—আমি যাব গার্ড দিতে। তারপর যদি স্বর্গের মাষ্টাররা আমায় মারে। ভয়ে ভয়ে কথাটা তুলতেই নারদমুনি আশ্বাস দিয়ে বললেন। স্বর্গে ও জিনিসটা এখনও আমদানি হয়নি। কেউ তোমার মাথার চুলটি পর্যন্ত ছোঁবে না। গটগট করে যাবে, গটগট করে আসবে। আমার লোক জটাজুট এসে তোমায় নিয়ে যাবে।···বিকেলে এখানে ফিরে এসেই তোমার জিনিসটা পেয়ে যাবে নেবু, ভেবে দেখো—সন্ধের সময় ওই আফিংটি না হলে কি তোমার চলবে? তুমি রাজী হয়ে যাও, আমি মহেশ্বরের

ভাঁড়ার থেকে তোমায় খাঁটি আফিং পাঠিয়ে দেব।' বাব্বা, নারদমুনিটি কি ফিচেল রে গজু, আমায় একেবারে ঠিক জায়গায় ঘা দিল। মুনিটুনিরা এই রকমই হয় সর্বদর্শী।'

আমি বললাম, 'আপনি তা হলে গার্ড দিতে গেলেন ?'

'হ্যা গেলাম—'নেবুমামা বললেন, 'গা স্পঞ্জ করে খেয়ে দেয়ে পান চিবোতে চিবোতে জটাজুটের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। আমায় কী সুন্দর দেখাচ্ছিলরে গজু, স্বর্গের স্বদেশী খাদির ধুতি, গায়ে ফতুয়া আর চাদর, মাথায় ব্যাণ্ডেজ—স্কুটার ট্যাক্সি চেপে জটাজুটের সঙ্গে খুশমেজাজে চললাম। ভেবে দেখলাম, কাজটা ভালই। আরে, আমি তো জীবনটা শুরু করেছিলাম মাষ্টারি দিয়ে। বছর খানেক পড়িয়ে ছিলাম। তারপর এ চাকরি সে চাকরি করে শেষে শা-ওয়ালেসে গিয়ে বড়বাবু হয়ে ছিলাম। তাছাড়া স্বর্গের দেবতাদের ছেলেপুলেরা কীভাবে পরীক্ষা দেয় সেটা তো দেখার রয়েছে। তোদের এখানে পরীক্ষা বলে আজকাল কিছু নেই, টুকলি আর টুকলি, নকল আর নকল, নকল করতে না পারলেই টেবিল চেয়ার ভাঙাভাঙি। স্বর্গে ব্যাপারটা কেমন চলছে দেখতে সাধ হল।'

'কী দেখলে ?'

'যা দেখলাম তা বলছি শোন। জটাজুট তো আমায় স্কুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। সকলেই দেখলাম আমার মতন মর্ত্য থেকে সন্থ এসেছে, গায়ে তখনও মর্ত্যের গন্ধ, নানান ধরণের লোক—বাঙালী, পাঞ্জাবী, বেহারী, জয়পুরী সব জাতেরই লোক দেখলাম। যে মাষ্টারগুলো ষ্ট্রাইক করেছিল—তাঁরা স্কুলের সামনে চাঁদোয়া টাঙিয়ে বসে দাবা খেলছিল, আমাদের দেখেও দেখল না। পরীক্ষার ঘণ্টা পড়তেই আমায় একজন পাঁচ নম্বর ঘরে পাঠিয়ে দিল। স্বর্গের স্কুল—বুঝলি তো, তার আদবকায়দাই আলাদা, যেমন ঘরবাড়ি তেমন ক্লাশরুম, ঠিক যেন তোর মেট্রো সিনেমা। ছেলেরা আসতে শুরু করল, দেবশিশুর দল কী চেহারা এক একটার একেবারে রাজপুত্তুর। কিন্তু বাবা, দেখলাম—ছেলেগুলো একেবারে মেয়েদের মতন সেজে এসেছে। লম্বা লম্বা চুল, বড় বড় জুলফি, চোখে সুর্মা, ঠোঁটে বোধ হয় লিপষ্টিকও লাগিয়েছে, চকরাবকরা জামা গায়ে, পরনে হাতি পা প্যান্ট। বুঝতে পারলাম স্বর্গেরও সর্বনাশ হয়ে গেছে, হিপিটিপি ঢুকে পড়েছে। তা চুলোয় যাক্ আমার কাজ সেরে আমি পালাবো। আমার কাঁচকলা অত ভেবে কী হবে।'

আমি বললাম, 'তা তো ঠিকই। আপনার কী! পরীক্ষা শুরু হল মামা?'

'হ্যাঁ শুরু হয়ে গেল। স্বর্গের ছাপাখানায় ছাপা কোশ্চেন পেপার আর্ট পেপারে ছাপা। টাইপটা দেবনাগরী। ওটা আমার রপ্ত নেই। ছেলেরা কোশ্চেন পেপার নিয়ে বসে পড়ল তাদের ডেস্কের সঙ্গে ফিট করা আলো, কলিং বেল, খাতা এমন কী একজোড়া করে অটোমেটিক কলম। ব্যবস্থায় কোনো খুঁত নেই। পরীক্ষা শুরু হবার পর বড়জোর দশ পনেরো মিনিট চুপচাপ। তারপর যা দেখলাম গজু, তুই বিশ্বাস করতে পারবি না।'

'কি দেখলেন মামা?'

'যা দেখলাম, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। ছেলেগুলো প্রথমে হাঁচতে শুরু করলো একসঙ্গে, সে কী হাঁচিরে, যেন লরির টায়ার ফাটছে, তারপর কাশতে শুরু করল, একসঙ্গে, সে কী কাশি রে বাবা, আমরা মর্ত্যের জীব—পিলে চমকে চমকে উঠতে লাগল। কাশি থামলে হাসি, হাহা হাহা হো হো হো হো করে সে যে কী ভীষণ অট্টহাসি, ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল, তারপর দেখি ওই ধেড়ে ধেড়ে ছেলেগুলো লম্ফ মেরে নাচতে শুরু করল, নাচের ঘটায় মনে হল একটা প্রলয় ঘটে যাবে এক্ষুনি লাফ মেরে মেরে সে যে কিসের গন্ধর্ব নৃত্য বুঝলাম না। তারপর ভাঙাভাঙি শুরু হল ডেস্ক, আলো, চেয়ার, কাগজপত্র কিছু আর বাকী থাকল না। ব্যাপারটা যে কেন এমন হচ্ছে আমি বুঝলাম না। পালাবার পথ দেখছিলাম। হঠাৎ একটা ছেলে ছুটে এসে আমার পথ আগলে দাড়াল। তেরিয়া ভঙ্গি। আমায় কী বলল জানিস?'

'কী?'
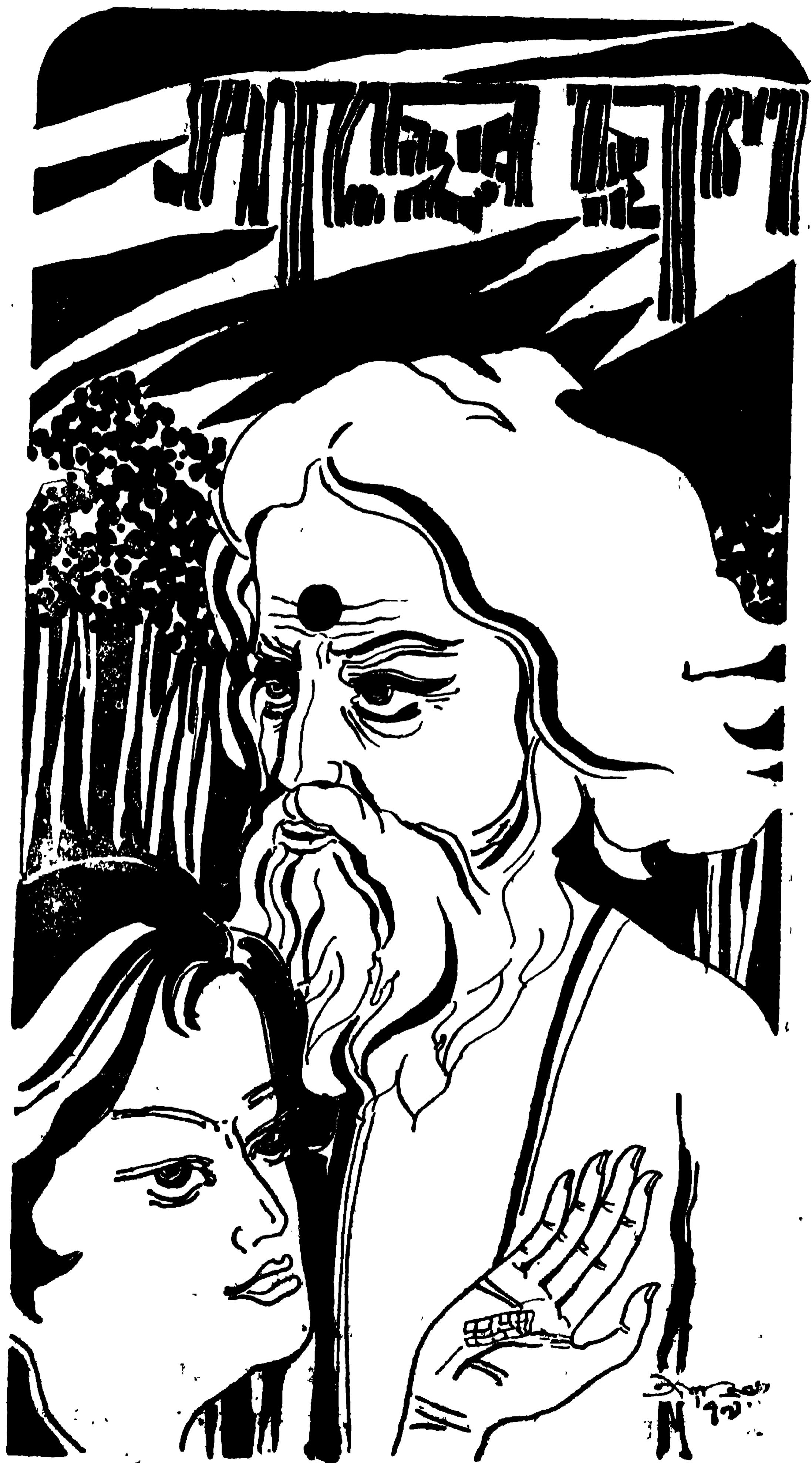
'বলল ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখোনি, না? নারদবুড়ো তোমায় নতুন আমদানি করেছে, তুমি আমাদের এখানে কেন এসেছ? গার্ড দিতে? দেববংশের ছেলেরা যেখানে পরীক্ষা দেয় সেখানে তুমি মানুষের বাচ্চা গার্ড দিতে এসেছ? এত আস্পর্দা! আমাদের দেশে ছুঁচ হয়ে ঢুকছো। বিদেশী হস্তক্ষেপ! চলবে না চলবে না। মেরে তোমার দাঁত উড়িয়ে দেব, মাথার খুলি ফাটিয়ে দেব।...গেট আউট। জলদি ভাগো।'

নেবুমামা হাত বাড়িয়ে মিছরির জলের গ্লাসটা টেনে নিয়ে এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, 'বুঝলি গজু, আমার মাথায় তখন নতুন খুলি, ক্রেশ ছিলু, দেখলাম দেবতাদের বাচ্চার হাতে খুলিটাকে দিয়ে আসা

বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ও বেটারাও তোদের মতন হয়ে গেছে। সেরেফ বই খুলে টুকবে বলে আমায় তাড়াতে চায়।...আমি হাত জোড় করে বললুম, 'বাবারা তোমরা ইন্দ্র, অরুণ, বরুণের বংশ দেববংশ—তোমরা আমায় মাপ করো, ভুল করে এখানে এসে পড়েছি—আমায় যেতে দাও, আমার মাথা টন্-টন্ করছে।'...তা মিষ্টি কথায় কাজ হল। আমায় ছেড়ে দিল। আমি কাঁচকোঁচা খুলে সেই যে দৌড় মারলাম—আর ফিরে চাইলাম না।'

গল্প শেষ হয়েছে দেখে আমি হেসে বললাম, 'নেবুমামা, স্বর্গে তাহলে আর যাচ্ছেন না?

নেবুমামা বললেন। 'পাগল! আর যায়?...তবে ব্যাপারটা কি জানিস গজু, আমি বেশ বুঝতে পারছি—ওই ফিচেল নারদবুড়োই আমায় কায়দা করে স্বর্গ থেকে তাড়াল। বুড়ো ভীষণ ধূর্ত।'

মা অনেক দিন ধরেই তাগাদা দিচ্ছিল একবার বড়মামার কাছে গিয়ে দিন কয়েক থেকে আসতে। অমুক ছুটিতে যাব, তমুক সময়ে যাব করে আমার আর যাওয়া হচ্ছিল না। বলতে কী, আমি কোনো গরজই পাচ্ছিলাম না যাবার। কার আর ইচ্ছে করে কলকাতা ছেড়ে, বন্ধুবান্ধব আড্ডা কাজকর্ম ফেলে বনজঙ্গলে গিয়ে বসে থাকতে!

বলে বলে মা যখন হয়রান হয়ে গেল, তখন চোখের জল ফেলতে লাগল। অভিমান করে বলত, 'সবই বুঝি, সম্পর্কটা তো আমার সঙ্গে, তোমাদের জেঠা-কাকা তো নয় যে, রক্তের টান থাকবে। সে বুড়োমানুষটা একা-একা পড়ে আছে একধারে, কেউ তাঁর খোঁজও করে না।' বাবাকে ঠেস দিয়ে কথাটা বলা; শুধু বাবাকে নয়, আমাদেরও।

দাদা আড়ালে আমায় বলল, 'যা না, একবার ঘুরে আয় না। তোর তো হরদম ছুটি।'

'বাঃ! তোমরা যে যার কাজ দেখিয়ে বসে থাকবে, আর আমায় গিয়ে পড়তে হবে পাগলের পাল্লায়?'

'পাগল কি রে! বড়মামার মতন মানুষ হয়? সাধুসন্ত মানুষ। চলে যা। তোর ট্রেন ভাড়া আমি দিয়ে দেব।'

দাদার কথা শুনে বউদি মুখ টিপে হাসল।

মা'র চোখের জল আর ভাল লাগছিল না। বললাম, 'ঠিক আছে, আসছে শনিবারেই যাব।'

মা ভেবেছিল, আমি মাকে স্তোক দিচ্ছি। শুক্রবারে সন্ধেবেলাতেই বুঝল, আমি সত্যি সত্যি পরের দিন বড়মামার কাছে যাচ্ছি।

আমার বড়মামা সম্পর্কে দুটো কথা এখানে বলতে হয়। বড়মামা তাঁর যৌবনকালে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন, পরে ঝগড়াঝাঁটি করে চাকরি ছেড়ে দেন। কিছুদিন মাইকার ব্যবসা করেন, তারপর কাঠের। বছর কয়েক কনট্রাক্টরিও করেছিলেন। তারপর আর কিছুই করেন নি। দেখতে দেখতে বয়েসও হয়ে গিয়েছিল, কাজকর্ম থেকে ছুটি নিয়েছিলেন বরাবরের জন্য। বড়মামার মনে শান্তিও ছিল না। দু'দুটো বিরাট ধাক্কাও খেয়েছিলেন। মামিমা মারা যান যেবছর, তার পরের বছরে মামার একমাত্র সন্তানও আচমকা মারা যায়। সেই থেকে মামা কেমন যেন হয়ে যান, সংসারে

কিম্বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় কাটিয়ে ফেলেছিলেন। একমাত্র মায়ের সঙ্গে মামার চিঠিপত্রে খানিকটা যোগাযোগ ছিল।

বড়মামা আমাদের কলকাতার বাড়িতে শেষ এসেছিলেন বছর পাঁচ আগে। একমুখ দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত চুল, পরনে ধুতি, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি আর কাঁধে চাদর। মানুষটিকে দেখতে ভালই লাগত, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা, চালচলন কেমন অস্বাভাবিক মনে হত। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, মামার মাথার কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছে। বাবাও সেটা মানতেন।

মা কিন্তু মামার জন্যে বরাবরই চিন্তা করত। বিশেষ করে মাস কয়েক আগে মামার অসুখের খবর শোনার পর থেকে মা বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। মা চাইত, আমরা কেউ মামার কাছে গিয়ে তাঁর খোঁজ খবর করে আসি। আমরা এড়িয়ে যেতাম। এবার আর এড়াতে পারলাম না, আমিই চললাম মামাকে দেখে আসতে।

কলকাতা থেকে এমন কিছু কাছে নয় পরেশনাথ। দুশো মাইলের মতন হবে। ট্রেনে উঠেছিলাম এগারোটা নাগাদ। মেল ন। তবু পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। পাহাড়ি জায়গা। পরেশনাথ পাহাড়টাই সবার আগে চোখে পড়ে। অন্ধকারে কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন মস্ত এক মেঘ জমে আছে আকাশের গায়ে।

ষ্টেশন থেকে হাঁটা পথে মামার বাড়িটা মিনিট কুড়ির রাস্তা। মন্দ লাগছিল না জায়গাটা। ফাল্গুনের শেষ। হু হু করে বাতাস ছুটছে; বাতাসের গন্ধই আলাদা, যেদিকে তাকাও গাছপালা, মাঠ, আকাশ, ঝরঝরে তারা। এক সময়ে এই জায়গা একেবারে ফাঁকা ছিল, ঘরবাড়ি ছিল না বললেই হয়। এখন অনেক ঘরবাড়ি হয়েছে। এসব আমার শোনা কথা। মায়ের কাছেই শুনেছি, মামার কাছেও।

আসবার আগে জায়গাটার সম্পর্কে যে ভয় ছিল, সেটা আর থাকল না। ঘরবাড়ি, মানুষজন, দোকান, বাস সবই রয়েছে; দু'তিনটে দিন ভালই কেটে যাবে।

বড়মামা আমায় দেখে মোটেই অবাক হলেন না। বললেন, 'আমি জানতাম তুমি আসবে।'

কেমন করে তিনি জানলেন আমি বুঝলাম না। আমি চিঠি দিয়ে আসি নি। মাও চিঠি দিয়েছে বলে আমি জানতাম না।

মামার বাড়িটা ছোটখাট। ব্যবস্থা সবই রয়েছে। আমার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় মামা বললেন, 'তুমি এসেছ ভাল করেছ। তোমায় আমি কতকগুলো কাজ দিয়ে যাব। আমি যখন থাকব না, কাজগুলো যাতে হয় সেটা তুমি দেখো।'

'কী কাজ?'

'সে পরে শুনো। বুঝিয়ে দেব।'

মামাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল, তিনি আরও বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। চুল সব সাদা, দাড়িও সাদা। চোখের দৃষ্টি অন্যমনস্ক, কী যেন ভাবছেন সব সময়। হাত পা রোগা রোগা দেখাচ্ছিল। ভাবলাম, অসুখের পরই হয়ত স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। খাওয়া-দাওয়া যৎসামান্য করেন। রাত্রে দেখলাম, দুধ আর এক মুঠো খই ছাড়া কিছু খেলেন না। চামচ দুই চিনি মিশিয়ে নিলেন দুধে।

আমি বললাম, 'এই খেয়ে আপনি থাকেন।'

মামা বললেন, 'আমার পক্ষে এই যথেষ্ট।'

'শরীর যে ভেঙে যাচ্ছে।'

'যাবার সময় হয়েছে বলেই যাচ্ছে।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না।

রাত্রে ঘুমোতে গিয়ে প্রথমটায় অস্বস্তি হচ্ছিল। নতুন জায়গা। চারদিক ফাঁকা। কেমন যেন ঝোড়ো বাতাসও দিচ্ছিল রাত্রের দিকে। বড় মামার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে কিন্তু চমৎকার লাগল। রাত্রে সামান্যই নজরে পড়েছিল দিনের আলোয় বাড়িটার সবই চোখে পড়ল। সামান্য পুরনো বাড়ি কিন্তু ভাঙাচোরা নয়। শোবার ঘর দুটো। মামার ঠাকুরঘর। ছোটমতন একটা ঘরে বইপত্র থেকে শুরু করে নানান রকম জিনিস ঠাসা। ভেতর বারান্দার একপাশে রান্নাঘর। সামান্য তফাতে কুয়োতলা। বাড়ির চারপাশেই বাগান, পেঁপে আর কলাগাছই বেশী। আম জামও রয়েছে। সামনের দিকে ফুলের বাগান।

সকালের দিকটা ঘোরাঘুরি করে, পুরনো বই ঘেঁটে, বিছানায় গা গড়িয়ে কেটে গেল। মামা আমায় তেমন ডাকাডাকিও করলেন না। বাড়িতে

বুড়ো মতন একটা লোক কাজ করে, নাম শিমুয়া। সে আমায় বেশ খাতির করছিল।

বিকেলে মামা বললেন, 'যাও একটু ঘুরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে, সন্ধেবেলায় বলব।'

মামার যে কী কথা, কী-ই বা কাজ আমার ঘাড়ে চাপাতে চান, কিছু আমার মাথায় আসছিল না।

খানিকটা ঘোরাঘুরি সেরে ফিরে আসতেই মামা ডাকলেন।

তাঁর শোবার ঘরেই তলব পড়ল।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মামা বললেন, 'এখানে শান্ত হয়ে বসো। আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো।'

আমি বসলাম।

খানিকটা অপেক্ষা করে মামা বললেন, 'তোমার মা'র কাছে কিছু শুনেছ কিনা আমি জানি না। আমার এই বাড়ি ছাড়া জমানো কিছু টাকা পয়সা রয়েছে। এই বাড়ি এবং টাকা পয়সা আমি তিন জনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। বাড়িটা আমি আশ্রমের জন্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমার গুরু-ভাই বঙ্কিমবাবু গয়ায় থাকেন। আমি যখন থাকব না, তুমি তাঁকে চিঠি লিখবে। তিনি এলে এ বাড়ির দায়িত্ব তাঁকে দিয়ে দেবে।'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, মামা হাত তুলে আমায় কথা বলতে বারণ করলেন।

'টাকাপয়সা যা আছে—তার দুটো সমান ভাগ হবে। এক ভাগ পাবে তোমার মা আর এক ভাগ আমি আশ্রমের নামে দিয়ে গেলাম।' বলে মামা একটা খাম দেখালেন, তাঁর পাশে রাখা ছিল। লম্বা খাম। মোটাসোটা। বললেন, 'আইনসঙ্গতভাবে যা যা করা দরকার—আমি সবই করেছি। তার কাগজপত্র এই খামের মধ্যে আছে। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

আমি বললাম, 'এ সব তো পরের ব্যাপার ; কিন্তু আপনি এখন থেকে পরের ব্যাপারটা কেন ভাবছেন ?'

'পরের ব্যাপার ? তুমি কি ভাবছ আমি আরও পাঁচ সাত বছর বেঁচে থাকব ?'

'থাকবেন না কেন ! মানুষের জন্ম মৃত্যুর কথা কে বলতে পারে !'

বড়মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ স্থির। ক্রমশই

দৃষ্টিটা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। হঠাৎ উঠে দাড়ালেন। বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিস রয়েছে। সেটা তোমায় দেখাই।'

মামা ঘরের এক পাশে গিয়ে আলমারি খুললেন। খুলে কী যেন বার করে আবার পাল্লা বন্ধ করলেন আলমারির। আমার কাছে এলেন।

মামার হাতে একটা কৌটো, গোল ধরণের। কৌটোর ঢাকনা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওর মধ্যে যে জিনিসটা আছে বার করে নাও। ছাখো।'

কৌটোটা হাতে নিয়ে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। মামার মাথা কি একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছে। কৌটোর মধ্যেটা দেখলাম। নজরে এল না।

'কী আছে এর মধ্যে ?'

'বার করে নাও। ছাখো।'

আঙুল ডোবাতে কী যেন ঠেকায় লাগল। কিছু একটা রয়েছে।

'হাতে ঢেলে নাও। ছাখো।' মামা বললেন।

হাতে নিয়ে দেখলাম, ছোট্ট একটু কাঠের টুকরো, পাতলা, দারচিনির মতন দেখতে। আমি বললাম, 'এটা কী ?'

'ওটা কি আমি জানি না। গাছের ছাল। কোন্ গাছ বলতে পারব না।···অনেক দিন আগে, তোমার মামিমা আর মামাতো ভাই যখন মারা গেল, আমি মাথা খারাপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। প্রত্যহ মনে হত আত্ম-হত্যা করি। একবার করতেও গিয়েছিলাম। তখন এক সাধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়। গোরখপুরে। তিনি আমায় ওই গাছের ছালটা দেন। বলে ছিলেন 'তুই বেটা অকারণ মরার চেষ্টা করছিস। এখন তুই মরবি না। এই জিনিসটা তুই নিয়ে যা। এটা যখন ছোট হয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে, তখন বুঝবি তোর আয়ু শেষ।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম মামার দিকে। বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ বলে না।

মামা নিজের মনেই বললেন, 'আমি বিশ্বাস করিনি। তবু ছালটা নিয়ে ছিলাম। ওটা অনেক বড় ছিল তখন, তা ধরো লম্বায় একটা গোটা পেনসিলের মতন। আলমারির মধ্যেই ফেলে রেখে ছিলাম। খেয়ালও করতাম না।

ধীরে ধীরে ওটা ছোট হয়ে আসতে লাগল। প্রথমে নজর করলাম—তখন মাপ করে রাখতাম। দেখতাম, ওটা আশ্চর্যভাবে কমে যাচ্ছে। তা হলেও তার একটা মাত্রা ছিল। গত বছর খানেক দেখছি বেশি বেশি কমে যাচ্ছে। কেন যাচছে, জানো?'

'না।'

'আমিও জানি না। বুঝতে পারছি না।'

আমার মনে হল, বোঝার কিছু নেই। সবটাই মামার পাগলামি। একটা গাছের ছাল।—যে কোন গাছেরই হোক—তার এমন কোনো অলৌকিক অদ্ভুত গুণ থাকতে পারে না যে, মানুষের আয়ু সে মাপ করবে। আমি কখনোই এসব মেনে নিতে পারি না।

মামা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি যে তাঁর কথা বিশ্বাস করছি না, বরং ব্যাপারটা আমার কাছে মজার ছাড়া আর কিছু নয়—এটা তিনি বুঝতে পারলেন।

মামা বললেন, 'তোমার কিছু বিশ্বাস হচ্ছে না?

আমি মাথা নাড়লাম। 'না।'

'আমারও তো প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু পরে যা দেখেছি তাতে বিশ্বাস হয়েছে।'

'আপনার চোখের ভুল হতে পারে।'

'না। আমার কাছে একটা খাতা আছে। তাতে হিসেব বলো মাপ বলো লেখা আছে।'

আমি বললাম, 'একটা শুকনো গাছের ছাল নাড়াচাড়া করতে করতে অল্পস্বল্প ভাঙতেই পারে।'

'তা পারে। কিন্তু ওটা তো ভাঙেনি। ক্ষয়ে যাচ্ছে। যদি ভাঙত তবে মাঝখান থেকেই ভেঙে যেতে পারত।'

আমি কোনো জবাব দিলাম না। কী জবাব দেব।

মামা খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললেন, 'আমি তোমায় বললাম না, গত বছর খানেকের মধ্যে ওই গাছের ছালটা বেশি বেশি ক্ষয় পেয়েছে?'

মাথা নাড়লাম।

মামা নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'কেন পেয়েছে আমি জানি না। তবে আমার একটা খটকা লাগছে।'

'কিসের খটকা ?'

'আমি এই একটা বছর নানারকম দুশ্চিন্তায় ছিলাম। দু-একটা এমন কাজ করেছি—যা করা উচিত হয়নি।' বলে মামা অল্প চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, 'মনোহর বলে একটা লোক এদিকে চুরিচামারি করে বেড়াত। একটা ডাকাতির ব্যাপারে আমি তাকে মিথ্যে মিথ্যে ধরিয়ে দিয়েছি। লোকটা আমায় গ্রাহ্য করত না। আমায় নিয়ে তামাশা করত। মনোহর এখন জেল খাটছে।'

আমি খানিকটা অবাকই হয়ে গেলাম। মামার মতন মানুষ মিথ্যে মিথ্যে একটা লোককে ডাকাতির মামলায় ধরিয়ে দিতে পারে এ আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনোহর চোর-ছ্যাঁচড় যাই হোক মামার তো কোনো ক্ষতি করেনি। তবে ? মামাকে সে গ্রাহ্য করত না এই রাগে মামা তাকে ধরিয়ে দেবেন ?

মামা বললেন, 'আর একটা অন্যায় কী করেছি জানো ?'

আমার জানার কথা নয়।

মামা সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার ছোটমামা আমায় লিখেছিল যে, আমাদের দেশের বাড়িটার আমার অংশ যেন আমি তাকে দিয়ে দিই। তার সংসার বড়। ঘরবাড়ি করার ক্ষমতা তার নেই। দেশের বাড়িটা সে সারিয়ে সুরিয়ে নিয়ে থাকতে পারবে।...তা আমি তার কথায় রাজি হইনি। বলেছিলাম, বাড়িটা বেচে আমার অংশের টাকা আমায় পাঠিয়ে দিতে। তোমার ছোটমামা আমার কথামতন কাজই করেছিল।'

আমার কেমন খারাপই লাগল। এসব কথা আমার জানা ছিল না। মা বলেনি। হয়তো বড় ভাইয়ের এই আচরণ মা'র নিজেরই এত খারাপ লেগেছিল যে, ছেলেদের কাছে আর ভাঙতে চায় নি। বড়মামাকে আমরা যা জানতাম, যা শুনেছি তাঁর সম্পর্কে, তা তা হলে সত্যি নয়! মামারও অহঙ্কার ছিল, রাগ ছিল, নীচতা ছিল মনে ? আশ্চর্য!
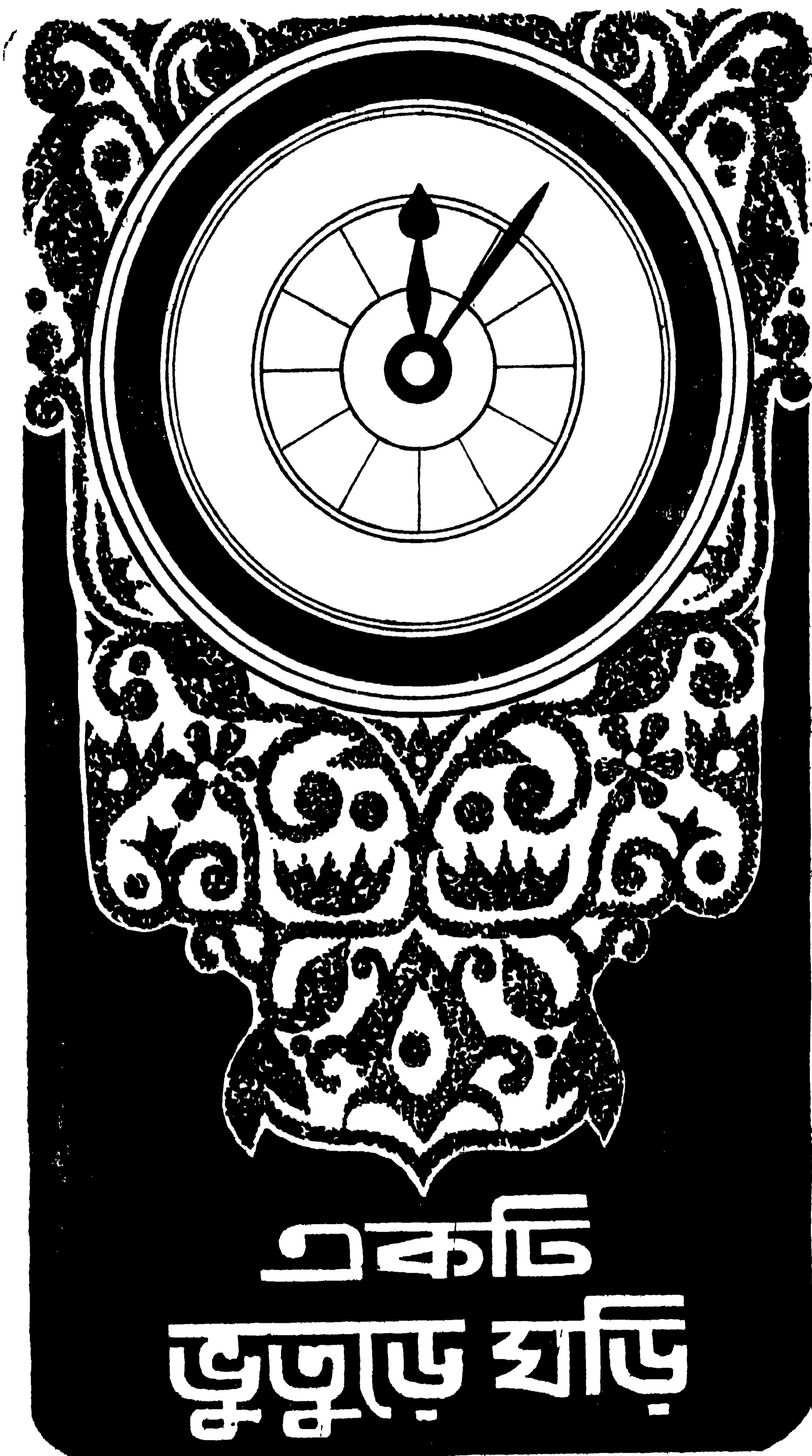
বড়মামা বড় করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বোধ হয় এই দুটো অন্যায়ের জন্যেই আমার এই অবস্থা।'

আমি বললাম, 'অন্যায়টা শুধরে নিন।'

মামা মাথা নাড়লেন। 'না, আর শুধরোনো যায় না।...তোমার হাতেই তো জিনিসটা রয়েছে। ওটার ক্ষয় হতে পারে—কিন্তু বৃদ্ধি হয় না।'

আমি অনেকক্ষণ ধরে গাছের ছালের টুকরোটা দেখলাম।

কলকাতায় ফিরে আসার পর মাকে কিছুই বলিনি। শুনলে মা দুঃখ পেত।

গাছের ছালটার কথাও আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বিশ্বাসও করিনি।

মাস তিনেক পরে একদিন বাড়ি ফিরে শুনলাম, টেলিগ্রাম এসেছে—বড়-মামা মারা গেছেন।

মাকে কিছুই বলতে হল না, আমি নিজেই বললাম 'কালই আমি পরেশ-নাথ যাব।'

একটি
ভুতুড়ে ঘড়ি

আমার বন্ধু নিত্যপ্রিয় কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করে যেত। সব সময় পারত না, কিন্তু সময় পেলে ঠিকই আসত। নিত্য আমার কলেজের বন্ধু, আমরা দু'চার জন খুবই গলায় গলায় ছিলাম। ওর বাড়ি সালানপুর। জায়গাটা কলকাতার খুব কাছে নয়—আবার এমন একটা দূর নয় যে, যাওয়াই যায় না। কলেজে পড়ার সময় নিত্য হোটেলে থাকত। তখন থেকেই সে কতবার আমাদের বলেছে তাদের সালানপুরের বাড়িতে যেতে। লোভ দেখিয়েছে অনেক, পুকুরে মাছ ধরার, পাখি শিকার করার, এখানে ওখানে বেড়াতে নিয়ে যাবার—তবু আমাদের যাওয়া হয়নি। মাছ ধরার কিংবা পাখি শিকার করার আমরা কিছু জানি না, বেড়াতে যাবার ইচ্ছে থাকলেও আল-সেমি করে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

গতবার শীতের মুখে নিত্যপ্রিয়র বাবা মারা গেলেন। চিঠি লিখেছিল নিত্য। শ্রাদ্ধের ছাপানো চিঠিও পেয়েছিলাম। যাব যাব করেও শেষ পর্যন্ত যেতে পারিনি আমার মায়ের অসুখের জন্যে। হঠাৎ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল মায়ের।

মা ভাল হয়ে যাবার পর নিত্যর চিঠি পেলাম। মায়ের খবর জানতে চেয়েছে। আমার নিজেরই খারাপ লাগছিল। এতদিন হয়ে গেল—বেশ কয়েকটা বছর—নিত্যর বাড়ি যাওয়া হল না। তার বাবার কাজের সময় অন্তত যাওয়া উচিত ছিল। তাও হল না।

আমাদের আর এক বন্ধু বিভূতিকে বললাম, 'যাবি? নিত্যর কাছে এবার যাওয়া উচিত, এই সময়টায় অন্তত। দিন তিন-চার ঘুরে আসি।'

বিভূতি রাজি। সে স্কুলে মাস্টারি নিয়েছে। পরীক্ষা-টরিক্ষা শেষ, ক্লাস প্রমোশানও হয়ে গেছে। হাতে তার কোনো কাজ নেই।

বড়দিন পেরিয়ে গিয়ে নতুন বছর পড়ছিল তখন। শীত পড়েছিল ভালই। এসময় দিনকয়েকের জন্যে বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসতে ভালই লাগে মানুষের।

সালানপুর জায়গাটা আসানসোল থেকে মাত্র দু তিনটে স্টেশন, মধুপুরের লাইনে। প্যাসেঞ্জার গাড়িতে না চাপলে মেরেকেটে ঘণ্টা ছয় সাতের ব্যাপার।

বিভূতি আর আমি সত্যি-সত্যি ট্রেনে চেপে বসলাম বছরের একেবারে শেষ দিনটিতে।

চিঠি লেখা ছিল। সালানপুরে গাড়ি পৌছতেই দেখি নিত্যপ্রিয় স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে।

প্লাটফর্মে পা ছোঁয়াতেই নিত্যপ্রিয় ছুটে এল। 'শেষ পর্যন্ত এলি তাহলে ? আয়।'

নিত্যপ্রিয়কে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছিল। অশৌচ, শ্রাদ্ধ, নিয়মভঙ্গ সবই কেটে গেছে যদিও, তবু তার জের যেন এখনও মিলিয়ে যায়নি ওর শরীর থেকে। সামান্য রোগা রোগা, শুকনো দেখাচ্ছিল। মাথায় এখনও চুল গজায়নি তেমন, ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা হয়ে রয়েছে। মুখটা বেশ ফ্যাকাশে।

বিভূতি নিত্যর পিঠে হাত রেখে বলল, 'তোর অবস্থা আমার আগেই হয়ে গিয়েছে। কেমন আছিস এখন ?'

'আছি এক রকম। আমরা সামলে নিয়েছি খানিক। মা এখনও ঠিক সামলে উঠতে পারে নি। মাকে নিয়েই যা মুশকিল।...নে, চল।'

নিত্যপ্রিয়র মুখে আগে শুনেছি অনেক, ধারণা করতে পারিনি। জায়গাটা সত্যি চমৎকার। যেদিকে তাকাও আকাশ যেন ঢলে পড়েছে। যেমন ফাঁকা, কত গাছপালা, শালুক পাতায় ভরে আছে পুকুর, শ্যাওলা রয়েছে, কিন্তু ঘোলাটে জল কোথাও নেই বড়। হা হা করছে মাঠ, সবজির ক্ষেত, ঘাসের ওপর জমে থাকা রাতের হিম এখনও শুকিয়ে ওঠেনি। রোদ টলটল করছে। বাতাসের গন্ধটাই আলাদা।

নিত্যদের বাড়ি এসে আরো অবাক হয়ে গেলাম। চারদিকে উঁচু পাঁচিল, বাড়িটাও এক বিচিত্র ছাঁদের, দুর্গ-দুর্গ দেখতে লাগে, জলে জলে শ্যাওলা জমে গেছে বাইরের দেওয়ালে, জানলাগুলো ছোট ছোট, কার্নিশে লোহার শিক পোঁতা। বাড়ির পেছন দিকে বাগান। ফলের গাছ অনেক রকম। বাগানের অন্যপাশে লোহা লক্কড়ের স্তূপ, মায় একটা ভাঙা বাড়ি।

দোতলার কোনার ঘরে আমাদের জায়গা করে রাখা হয়েছে। খাট বিছানা সাজানো।

এই বাড়িটা নিত্যদের দু পুরুষের। তার ঠাকুরদা শুরু করেছিলেন। বাবা শেষ করেছেন। নিত্যকে কিছু করতে হবে না। জমি জায়গা দেখাশোনা করে আর কোলিয়ারির ঠিকাদারি করে দু' পুরুষে অবস্থা বেশ সচ্ছলই করে গেছেন নিত্যর পূর্বপুরুষেরা। নিত্যও ঠিকেদারি কাজ নিয়ে আছে। এক সময়ে এদিকে ডাকাতির খুব উপদ্রব ছিল। কাজেই বাড়িটাকে ওইরকম

দুর্গের মতন চেহারা করে গড়ে তুলতে হয়েছে। বন্দুক-টন্দুকও আছে বাড়িতে।

খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব করে দুপুরটা কাটল। বিকেলে বেরোলাম বেড়াতে। ভালই লাগছিল। তবে শীতটা বড় বেশি। আমাদের মতন কলকাতার শহুরে বাবুদের গায়ের চামড়ায় এ শীত সহ্য হয় না। উত্তুরে বাতাস দিতে লাগল কনকনে, ঝপ করে আকাশ থেকে অন্ধকারটাও খসে পড়ল। আর বেড়ানো হল না। বাড়ি ফিরলাম।

বাড়ি ফিরে চা. মুড়ি, আলুর ঝাল-ঝাল বড়া, বেগুনি খেতে খেতে হাজার রকম গল্প। একটা ছোট পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বালিয়ে ছিল নিত্য; সেটা জ্বলতেই লাগল। বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার।

গল্পে গল্পে রাত হয়ে গেল খানিকটা। নিত্যর ছোট ভাই বার কয়েক তাগাদা দিল। আমরা খেতে চললাম অন্য ঘরে।

নিত্য তার শোবার ব্যবস্থা আমাদের সঙ্গেই করেছিল কারণ আর কিছু নয়, আড্ডা আর গল্প। সর্বক্ষণ সে আমাদের আঁকড়ে থাকতে চায়।

খেয়ে এসে আবার আমরা বসলাম। এবারে আর পেট্রোম্যাক্স নয়, লণ্ঠন জ্বলতে লাগল ঘরে।

তিন বন্ধু সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে বসে গল্প করছি। করতে করতে নিত্যর বাবার কথা উঠল। তার বাবার মৃত্যু থেকে কথাটা গড়িয়ে গড়িয়ে আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম, জাতিস্মর এইসব প্রসঙ্গ থেকে একেবারে ভূতের প্রসঙ্গে চলে গেল।

আমি বরাবরই একটু ভিতু গোছের লোক। ভূত মানি আর না মানি গা ছমছমে গল্প শুনলে অস্বস্তি হয়। তার ওপর ওই নতুন জায়গা। ঘরের মধ্যে তাকালে ছাদটাও ভাল করে চোখে পড়ে না—এত উঁচু ছাদ, আর এমনই মিটমিটে আলো। তিন চারটে কুলুঙ্গিতে যেন অন্ধকারের তাল জমে আছে। দেওয়াল-তাক গোটা দুই, দেখতে চোরা দরজার মতন।

বিভূতি স্কুলের সায়েন্স টিচার। ফিজিক্স আর অঙ্ক পড়ায়। নিজেকে সে কী ভাবে জানি না; তবে আমার মতন ভিতু নয়। ভূতটুত মানে না। ভূতের গল্পে তার রুচি থাকলেও ভূতে নেই। বিভূতি ইয়ার্কি ঠাট্টা করছিল। তামাশা করছিল।

রাত হয়ে যাচ্ছে। লম্বা একটা হাই তুলে বিভূতি বলল, 'ভূতের ব্যাপারে

আমার থিয়োরি হচ্ছে—যার ভূত ভবিষ্যৎ কোনোটাই নেই সেইটেই হচ্ছে আসল ভূত।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'প্রায় তোর মতন অবস্থা তাহলে!'

বিভূতি বলল, 'ঠিক বলেছিস। আমরাই যথার্থ ভূত।'

এমন সময় নিত্য হঠাৎ বলল, 'তোদের একটা জিনিস দেখাব। দেখবি?'

'ভূত দেখাবি?' বিভূতি তামাশা করে বলল, 'তোদের এই বাড়ির চারপাশে যত নিম, বেল, কাঁঠাল গাছ, তাতে দু চারটে ভূত থাকলেও থাকতে পারে।'

নিত্য বলল, 'না, বাইরে নেই। ভেতরেই এক জিনিস আছে, যার ভয়ে আমি মরছি। দাঁড়া; আসছি।'

নিত্য উঠে গেল।

আমার ঘুম পাচ্ছিল। দুপুরে এক চোট ঘুমিয়েছি। তবু। বাইরে এলে বোধ হয় একটু বেশী ঘুম পায়। তার ওপর বাইরে শীতের হাওয়ার শব্দ, ঘরে কনকনে ঠাণ্ডা, লেপের আরাম, ঝাপ্সা ঘর—ঘুমের আর দোষ কোথায়! নিত্য কোন্ জিনিস এনে দেখায়, তার জন্যে কৌতূহলও হচ্ছিল।

দুটো খাট পাশাপাশি আমাদের জন্যে পাতা। নিত্যর জন্যে একটা নেয়ারের খাট। মশারি রয়েছে, শোবার সময় টাঙিয়ে নেব।

শীতটা বাস্তবিকই এখানে বেশি। ঘরের মধ্যেও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। লেপ চাপা দিয়ে বসে আছি আমরা।

নিত্য ফিরে এল।

ফিরে এসে বিছানায় বসল। বলল, 'এই জিনিসটা দেখ।'

দেখার মত অদ্ভুত কিছু নয়। একটা পকেট ঘড়ি। মান্ধাতার আমলের।

বিভূতি হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা নিল। এরকম ঘড়ি আজকাল আর দেখা যায় না। ব্যবহার করে না কেউ। আগে খুব চলন ছিল। চেন বাঁধা পকেট ঘড়ি আমিও দেখেছি, আমার বড় মামা বরাবর ব্যবহার করত।

ঘড়ির উপর ঢাকনা ছিল। বুড়ো আঙুল দিয়ে আঙটা টিপতেই খুলে গেল।

ঝুঁকে পড়ে আমরা দেখতে লাগলাম। ডায়ালটা ময়লা হয়ে এলেও রোমান হরফের দাগগুলো পড়া যায়, কাঁটা দুটোও ঠিক আছে। কোন কোম্পানির ঘড়ি বোঝা গেল না, লেখাটা মুছে গেছে—দু একটা অক্ষরই শুধু চোখে পড়ে আবছা ভাবে।

বিভূতি বলল, 'তোর বাবার ঘড়ি?'

নিত্য বলল, 'না, আমার ঠাকুরদার।'

'তা এতে দেখবার কী আছে? পকেট ঘড়ি। বাইরের ডালাটায় কারুকাজ রয়েছে। এই তো?

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিত্য কেমন করে যেন হাসল, মরা হাসি। বলল, 'ঘড়িটা এখনও চলে। দেখবি?' বলে ঘড়িটা নিয়ে পুরো দম দিল নিত্য। দম দিয়ে বিভূতির হাতঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে দিল। দশটা পঞ্চান্ন। বলল, 'ঘড়িটা চলছে। কানে দিয়ে শোন।'

কানের কাছে ঘড়ি নিয়ে শুনল বিভূতি। আমারও হাতে দিল। আমিও শুনলাম। টিকটিক শব্দ হচ্ছে। সেকেলে ঘড়ি, সেকেণ্ডের কাঁটা নেই— থাকলে কানে শুনতে হত না।

ঘড়িটা ফেরত নিয়ে নিত্য বিছানার ওপর রেখে দিল। বলল, 'ঘণ্টাখানেক আমাদের জেগে থাকতে হবে।'

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

নিত্য বলল, 'ঘড়িটা এখন ঠিক চলবে। বারোটা বেজে সাত মিনিটের পর আর চলবে না।'

'তার মানে?'

'দেখ না। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা কর।'

বিভূতি বলল, 'তুই বলছিস—বারোটা বেজে সাত মিনিটে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবে?'

'কাঁটায় কাঁটায়।'

'কেন?'

'তা জানি না।' বলে একটু থেমে আবার কী বলতে যাচ্ছিল, না বলে থেমে গেল।

বিভূতি বিশ্বাস করল না। আমিও না। যে ঘড়িটায় এইমাত্র দম দেওয়া হল সেই ঘড়ি কী করে ঘণ্টাখানেক পরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে? যদি এমনই হয় ঘড়িটা খারাপ, তবে সেটা বারোটা বেজে সাত মিনিটের আগেও বন্ধ হতে পারে, পরেও পারে। ঠিক বারোটা সাতে বন্ধ হবে কেন?

বিশ্বাস করার কারণ ছিল না। আমরা বিশ্বাস করলাম না। অবশ্য কৌতূহল হল।

ঘড়িটা বিছানার ওপর রেখে আমরা বসে থাকলাম। বিভূতি এটা সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগল। নিত্য বলল, এখন সে কিছুই বলবে না আগে আমরা দেখি সে যা বলেছে তা সত্যি কিনা!

বিভূতি দু চারবার ঠাট্টা তামাশা করল। তারপর আমরা সময় কাটাবার জন্যে অন্য গল্প করতে লাগলাম। মন আর চোখ পড়ে রইল ঘড়ির কাঁটায়।

শীতের দিন। আগে বুঝিনি, ঘড়িতে রাত দেখার পর ঘুম যেন চোখের পাতায় চেপে বসছিল। ঘন ঘন হাই উঠছিল। কথা জড়িয়ে আসছিল ঘুমে।

এই ভাবে বারোটা বেজে এল।

আমরা চোখের পাতা রগড়ে সোজা হয়ে বসলাম। আর কিছুক্ষণ মাত্র। দেখা যাক, নিত্য আমাদের সঙ্গে তামাশা করল কিনা!

বিভূতি বলল, 'নিত্য, তুই যদি ধাপ্পা মেরে থাকিস, তোকে আমি বাইরে বার করে দেব!'

নিত্য জবাব দিল না কথার, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল।

কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। বাইরে কোনো সাড়াশব্দ নেই, এই বাড়িটাও নিঃসাড়। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঝুম চারদিক। আমরা তিনজন মাত্র জেগে আছি।

চোখের পাতা থেকে ঘুম যেন একটুর জন্যে সরে গেল। দেখি, নিত্য একদৃষ্টে ঘড়ির দিকে চেয়ে আছে। তার চোখেমুখে কেমন যেন উত্তেজনা। ভয়। বিভূতি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখছিল ঘড়িটা। আমার হঠাৎ কেমন গা শিউরে উঠল। ভয়ভয় করতে লাগল। যদি নিত্যর কথা সত্যি হয়, তবে?

বারোটা তিন হল। আমার বুক ধকধক করছিল। বারোটা চার। নিত্য একদৃষ্টে চেয়ে, চোখের পাতা পড়ছে না। বিভূতি ঝুঁকে পড়ল।

বারোটা পাঁচ। ঘড়ি চলছে। মিনিটের কাঁটাটা এত আস্তে নড়ছে কিছুই বোঝা যায় না। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বারোটা ছয়। বিভূতি একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর নিত্যর দিকে। কোনো কথা বলল না। আমি আরও ঝুঁকে পড়লাম। বুক কাঁপছিল।

বারোটা সাত।

আমাদের তিনজনের চোখ ঘড়ির কাঁটার ওপর স্থির হয়ে আছে, নড়ছে না। তাকিয়ে আছি, তাকিয়ে আছি···সময় কাটছে তবু কাঁটা আর নড়ছে

না। বিভূতি ধৈর্য হারিয়ে তার হাতঘড়ি দেখল, বারোটা নয়। তারপর পকেট-ঘড়িটা তুলে নিয়ে কানের কাছে রাখল। তার মুখ কেমন থম মেরে গেল। অবাক, বিমূঢ়, ভীত। বলল, 'বন্ধ হয়ে গেছে।'

নিত্য এতক্ষণ পিঠ নুইয়ে বসেছিল। পিঠ সোজা করল এবার। হাঁফ ফেলল স্বস্তির। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'এই রকমই হয়; বারোটা সাতে বন্ধ হয়ে যায়।'

আমি বেশ ভয় পেয়েছিলাম। বললাম, 'কেন?'

নিত্য বলল, 'এখন আর বলব না। কাল শুনিস।'

বিভূতি বলল, 'দিনের বেলা বন্ধ হয় না? বারোটা সাতে?'

'না।'

'অসম্ভব। এ রকম হতেই পারে না।'

'হয়।'

'আমি কাল দেখব।'

'আমি দেখেছি কতবার।'

'আমি নিজের চোখে দেখব।...কেমন করে এটা সম্ভব?'

'কী জানি কেমন করে হয়! আমিও বুঝি না।'

আমি বেশ ভয় পেয়েছিলাম। ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'ঘড়িটা ভূতুড়ে। ওটা সরা। আমার বিছানা থেকে সরিয়ে নে। সারারাত আজ আর আমার ঘুম হবে না।'

পরের দিন সকাল থেকেই বিভূতি ঘড়িটা নিয়ে পড়ে থাকল। তার জেদ। সে দেখতে চায় কেন একটা ঘড়ি এই রকম বিচিত্র ব্যবহার করবে। এ তো মানুষ নয় যে, তার খেয়াল খুশি থাকবে। ঘড়ি হল যন্ত্র। যন্ত্রের কোনো খেয়ালখুশি থাকতে পারে না, যদি বা থাকে, তাকে আমরা যান্ত্রিক গোলযোগ বলি; যান্ত্রিক কারণ ছাড়া তা হতে পারে না।

সকালের দিকে বিভূতি ঘড়িটা চেয়ে নিয়ে আবার একটু দম দিল, নাড়াচাড়া করল, সময় মিলিয়ে দিল। ভূতুড়ে ঘড়িটা চলতে লাগল আবার।

নিত্য আমাদের নিয়ে কাছাকাছি বেড়াতে বেরুল। হাঁটাহাঁটি করলাম খানিক। স্টেশনের সামনে একটা মেঠো চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম। রোদ, ধুলো, শীতের বাতাস খেয়ে বাড়ি ফিরলাম বেলা করে। যাই করি না

কেন, মাথার মধ্যে ঘড়ি। ঘড়ি ছাড়া চিন্তা নেই। নিত্যকে কিন্তু মনমরা দেখাচ্ছিল।

খুবই আশ্চর্যের কথা, দিনের বেলায় ঘড়িটা ঠিকই চলছিল। কে বলবে অত পুরনো এক পকেট ঘড়ি এইভাবে চলতে পারে। বেলা বারোটা পেরিয়ে গেল। আমি আর বিভূতি ভেবেছিলাম—ঘড়িটা থেমে গেলেও যেতে পারে। থামল না। বারোটার কাঁটা ছাড়িয়ে ছোট কাঁটাটা একটায় পৌছল, তারপর দুটোয়। বিভূতি রীতিমত ঘাবড়ে গেল। নানারকম যুক্তি বার করতে লাগল, আঙ্কিক যুক্তি। কাগজ কলম নিয়ে অঙ্ক কষতে বসল খেপার মতন। শেষে বিরক্ত হয়ে বলল, ধ্যুত্, এ আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে আজ আর একবার রাত্রে দেখব সত্যিই ঘড়িটা বরোটা সাতে বন্ধ হয় কিনা!'

আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, ঘড়িটা ভুতুড়ে। যথা সময়ে ওটা আবার বন্ধ হবে।

বিভূতি তবু জেদ ধরে থাকল। নিত্য আপত্তি করল। কী হবে আর ঘড়ি দেখে? বিভূতি শুনল না। তার বড় জেদ।

রাত্রে আবার আমরা তিনজন ঘড়ি নিয়ে বসলাম।

আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। নিত্যকে বললাম, 'ঘড়িটা তোরা তো ব্যবহার করিস না?'

'না।'

'এতকাল ওটা ঠিক আছে কেমন করে?'

'তাও জানি না। বাবা দু চারবার ঘড়িটা কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে ছিলেন।'

'তখনও কি এই রকম ভাবে বন্ধ হত?'

'হত। বাবার নজরেই ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ে। বাবাও বিশ্বাস করেন নি, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছেন। দোকানের লোকেরাও কিছু বলতে পারে নি।'

'আশ্চর্য!'

'ঘড়িটা বাবার ঘরে থাকত। ড্রয়ারের মধ্যে। বাড়ির কারও আপদ বিপদ ঘটলে দম দিতেন।,

'কেন, আপদ বিপদ ঘটলে কেন?'

'সে একটা ব্যাপার আছে।' শুকনো মুখে নিত্য বলল

'তুইও দমটম দিস ?'

'না।'

'কেন ?'

'কী হবে দম দিয়ে ?'

আমি নিত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওকে কেমন অন্যমনস্ক, গম্ভীর, মনমরা দেখাচ্ছিল।

কথায় কথায় রাত বাড়ল। এগারোটা বাজল। দেখতে দেখতে সাড়ে এগারো। তারপর ঘড়ির ছোট কাঁটা বারোটার দিকে এগুতে লাগল।

আমি বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম ঘড়িটা ঠিক সময়ে থেমে যাবে। বিভূতির সন্দেহ যায়নি।

ঠিক যখন বারোটা তখন নিত্য কেমন চঞ্চল বিহ্বল হয়ে বিভূতির হাত ধরে ফেলল। তারপর থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমরা হতভম্ব।

বিভূতি বলল, 'কীরে, তোর হল কী ?'

নিত্যর দু চোখে জল। ঠোঁট ফুলে উঠেছে। কেঁদে ফেলল নিত্য।

ঘড়ির দিকে একবার তাকালাম আমি। পলকের জন্যে। বারোটা বেজে দু মিনিট।

বিভূতি আবার বলল, 'তুই অমন করছিস কেন ? কী হয়েছে তোর ?

নিত্য কান্না জড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলল, 'বাবা মারা যাবার দিন ঘড়িটা বারোটা সাতের পরও চলছিল। আমি দেখেছি।'

'তার মানে ?'

'ঘড়িটা আমাদের সংসারের অমঙ্গলের কথা, মৃত্যুর কথা বলে দেয়। আমার কাকা, আমার মেজ ভাই, বাবা—এই তিনজনের মৃত্যুর দিনই ঘড়িটা চলেছে, বাবা চালিয়েছিলেন। আর কোনোদিন কখনো চলেনি। আমার আজকাল আর ঘড়িটা দেখতে ইচ্ছে করে না। ভয় হয়।...আজ দুপুর থেকে মায়ের শরীর খারাপ...।'

নিত্য কাঁদতে কাঁদতে ঘড়ির দিকে তাকাল।

বিভূতি কেমন যেন চমকে গিয়ে ঘড়িটা তুলে নিল। নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডালাটা বন্ধ করে দিল।

আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। নিত্যর মুখ সাদা।

ঘড়ির কাঁটাটা বারোটা সাতে থামার জন্যে আমরা ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ছিলাম। বিভূতির হাত কাঁপছিল। আমার বুক ধকধক করছিল। আর নিত্য কাঠ হয়ে বসে ছিল।

বারোটা সাতের দিকে ঘড়ির কাঁটাটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিল। ডালার তলায় কি হচ্ছে, তা দেখার সাহস আমাদের হচ্ছিল না।

চিত্তশুদ্ধি আশ্রম

চাকরি থেকে রিটায়ার করলে মানুষ কেমন হাঁসফাঁস করে প্রথম দিকটায়। কারও শরীর ভেঙে যায়, কারও ব্লাডপ্রেসার চাগায়, কেউ বা সারাদিন বড়-বড় ঢেঁকুর তোলে, কাউকে আবার দেখেছি রাত্রে শোবার আগে কবিরাজী তেল মেখে ঘুমের সাধ্যসাধনা করে। প্রথম ধাক্কাটা সামলানো খুবই মুশকিল, সব কেমন ওলট পালট হয়ে যায় বলেই বোধ হয়। এক একজন এই বিশ্রী অবস্থাটা কাটাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে কাশী-হরিদ্বার-বৃন্দাবন ঘুরতে; কেউ বা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কারও বা নেশা ধরে তাস-পাশায়। গাছপালা-বাগান-কুকুর-বেড়াল, এসব নিয়েও কেউ কেউ মেতে ওঠে। গোড়ার ধাক্কাটা একবার সামলে নিতে পারলেই হল, তারপর ধীরে ধীরে সব সয়ে যায়।

আমাদের মহাদেব জ্যাঠামশাইকেই প্রথম দেখলাম, যেদিন চাকরি থেকে মুক্তি পেলেন, তার পরের দিন থেকেই আহ্লাদে আটখানা। ধানবাদে আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। বাবার বন্ধুর মতন। বয়েসে সামান্য বড় বলে বাবা তাঁকে দাদা বলতেন। আমরা বলতুম, জ্যাঠা-মশাই। বেঁটেখাটো মানুষ, গোলগাল চেহারা, গায়ের রঙ ফরসা। মাথার মাঝমধ্যিখানে সিঁথি করে চুল আঁচড়াতেন। সাবেকী গোঁফ ছিল তাঁর। মাথার চুল, গোঁফ দশ আনাই সাদা হয়ে গিয়েছিল জ্যাঠামশাইয়ের।

আমরা থাকতাম ভাড়া-বাড়িতে। জ্যাঠামশাইদের বাড়িটা ছিল নিজে-দের। পুরনো বাড়ি। দোতলা। সংসারে মানুষ বলতে ছিলেন জ্যাঠা-মশাই, জ্যাঠাইমা, আর ঠাকুমা। মাঝে-মাঝে ডুমকা থেকে রাধাদি আসত বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে।

জ্যাঠামশাই আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমাকে একটু বেশী। আমার বাবাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতন মনে করতেন।

এই জ্যাঠামশাইকে দেখলাম, চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তুড়ি মেরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। না গেলেন তীর্থধর্ম করতে, না বসলেন তাস-পাশার আড্ডায়। তাঁর শরীর ভাঙল না, রোগটোগ কাছে ঘেঁষল না, যেমন-কে-তেমন চেহারা নিয়ে জ্যাঠামশাই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বাবা বললেন, 'মহাদেবদার ধাতই আলাদা। ও মানুষ কি সহজে ভাঙেন।'

জ্যাঠামশাই যে ভাঙার পাত্র নন, সেটা আমরাও জানতাম।

একদিন কিন্তু একটা ঘটনা ঘটল।

জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে গল্পটল্প করে চলে যাবার পর বাবা হাঁক দিয়ে মাকে বললেন, 'শুনেছ, মহাদেবদা আশ্রম খুলবেন।'

আশ্রমের কথা শুনে মা যেন খুশীই হলেন। বললেন, 'ভালই হল। আমাদের এদিকে আশ্রমটাশ্রম নেই, ওই এক শিবমন্দির। আশ্রম খুললে তবু দু দণ্ড গিয়ে বসতে পারব। ঠাকুরের গানটান হবে।'

বাবা বললেন, 'সে গুড়ে বালি। মহাদেবদা চিত্তশুদ্ধি আশ্রম খুলবেন।'

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা কী? চিত্তশুদ্ধি আশ্রমটা আবার কেমন জিনিস?'

'বুঝলাম না', বাবা মাথা নেড়ে বললেন, 'ভেঙে কিছু বললেন না; তবে তোমার ঠাকুর দেবতাদের জায়গা বোধ হয় ওই আশ্রমে হবে না। দেখো কী হয়।'

আমরা ছেলেমানুষ। বড়দের কথায় কথা বলতে নেই। কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। বলাইদের পাড়ায় একটা আশ্রম আছে; সেখানে মাঝে মাঝে উৎসব হয়। উৎসবের দিন আশ্রমে গেলেই ভিজে ছোলা, গুড় বাতাসা, কলা, দু-একটা টুকরো বাতাবি লেবু, চিনির মণ্ডা পাওয়া যায়। জ্যাঠামশাই ওই রকম একটা আশ্রম খুললে মন্দ হত না। মাঝে মাঝে কিছু পাওয়া যেত।

জ্যাঠামশাইয়ের আশ্রম সম্পর্কে তেমন কোনো কৌতূহল আমাদের তখন আর জাগল না।

এর কয়েকদিন পরে দেখলাম, জ্যাঠামশাইদের বাড়ির নীচের তলা সাফ-সুফ হচ্ছে। তারপর এল বালি, সুরকি, দু-চার গাড়ি ইট। মিস্ত্রী মজুর খাটতে লাগল। নীচের তলার ব্যবস্থা বেশ পালটে ফেললেন জ্যাঠামশাই। গোটা দুই ঘর হল; উঠোনে জলকলের ব্যবস্থা করলেন; ভেতর বাড়ি আর বাইরের বাড়ির মধ্যে একটা পাঁচিল গাঁথা হল। চুনকাম-টুনকামও হয়ে গেল একদিন।

এরপর দেখি দড়ির খাটিয়া এল গোটা ছয়েক। ধুনুরী ডেকে পাতলা-পাতলা তোশক-বালিশ বানানো হল। শেষে একটা ছোট সাইনবোর্ডও লাগানো হল বাড়ির বাইরের দিকে। তাতে লেখা থাকল: চিত্তশুদ্ধি আশ্রম।

বাবা বললেন, 'মহাদেবদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শুনছি উনি নাকি

যত চোর-বাটপাড়-পাগল এনে ওই আশ্রমে রাখবেন। বাড়ির মধ্যে একী কাণ্ড। বউদি চেঁচামেচি করছেন, মাসিমা কাঁদছেন। কী পাগলামি বল তো!'

আমরা ছেলেমানুষ হলেও বুঝতে পারলাম, একটা অদ্ভুত কিছু হতে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাই যেমন-তেমন মানুষ নন, নিশ্চয় অনেক ভেবে চিন্তে কাজে নেমেছেন। লোকে তাঁকে পাগল বলুক আর যাই বলুক, তিনি যা ঠিক করেছেন তা থেকে নড়বেন না।

চিত্তশুদ্ধি আশ্রম সম্পর্কে আমাদের রীতিমত কৌতূহল জাগল। পাড়ার লোকজনও দেখলাম জ্যাঠামশাইদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সাইনবোর্ডটা, হাসাহাসি করছে। কেউ বলছে, দত্তমশাই উন্মাদ হয়ে গেছেন; কেউ বা রসিকতা করে বলছে, দত্তবাবু নিশ্চয় হোটেল খুলবেন।

যার যা খুশি বলুক, আমরা তিন ভাইবোন কিন্তু জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে দুবেলা আসা-যাওয়া করতে লাগলুম। জ্যাঠাইমার মুখ গম্ভীর; ঠাকুমা চুপচাপ। জ্যাঠামশাই আগের মতনই হাসিখুশী। নীচের ঘরে তিনি একটা টেবিল পেতেছেন, টেবিলের ওপর রুলটানা খাতা, দোয়াত কলম, লাল নীল পেনসিল, একটা মোটাসোটা রুল আর দু একটা বই রেখে অফিস-ঘর সাজিয়েছেন।

আমরা রোজই ঘুরঘুর করি ও-বাড়িতে। একদিন জ্যাঠামশাই আমাদের ডাকলেন। ডেকে নীচে অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমি, কালু আর লতু বেঞ্চিতে বসলাম।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'তোরা নীচের ঘরটর সব দেখেছিস ভাল করে?'

তিনজনেই মাথা নাড়লাম। দেখেছি।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'কাল দুপুর থেকে আমার আশ্রমে লোক আসতে শুরু করবে। বগলাকে চিনিস?'

আমাদের এদিকে তিনজন বগলা আছে। একজন বাড়ি-বাড়ি কলের জল দেয় খাবার জন্যে; একজন পোস্টাফিসের পিয়ন; আর একজন থাকে বাজারে। আমি বললাম, 'কোন বগলা?'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'বাজারের বগলা।'

বাজারের বগলার বড় দুর্নাম। সে ফলমূল বেচে। অর দোকান নেই।

রাস্তায় বসে শস্ত, কলা, শুকনো কমলালেবু, শাক-আলু এইসব বিক্রি করে। গরীব লোক। অল্পস্বল্প যা জোগাড় করতে পারে তাই বেচে দিন চালায়। লোকটা ভীষণ মানুষ ঠকায়। ছেলেমানুষ দেখলে তো কথাই নেই, ফিরতি পয়সাও কম দেবে। অচল পয়সাও চালিয়ে দেয়।

বগলার নাম শুনে আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'বগলা তো চোর, জ্যাঠামশাই।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'চোর নয় লোভী। দু পয়সার জিনিস বেচে পাঁচ পয়সা পকেটে ভরতে চায়। আমি ওকে শুধরে দেব। ওর চিত্তশুদ্ধি দরকার।'

কালু বলল, 'বাজারে গণেশ আছে ; সে আরও চোর।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি সব লিষ্ট করে ফেলেছি। ঘুরে ঘুরে, দেখে দশজনের লিষ্টি করেছি। বগলাকেই প্রথম আনব। বগলার পরে আনব পঞ্চাকে।'

পঞ্চার নামে লতু সিঁটিয়ে গেল। বলল, 'ও জ্যাঠামণি, পঞ্চা ভীষণ পাজী। ওর একটা পোষা নেউল আছে। আমাদের স্কুল যাবার সময় ভয় দেখায়।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'পঞ্চার মাথায় ছিট আছে খানিকটা। একসময়ে ষ্টেশনে মুসাফিরখানায় পড়ে থাকত। মালপত্তরও সরাত। পুলিশের হাতে শিক্ষা পেয়ে শুধরেছে অনেকটা। তবু পুরনো অভ্যেস পুরোপুরি যায়নি। ওরও চিত্তশুদ্ধি দরকার।'

আমরা তিন ভাই বোনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে উঠে এলাম। কিছু তো আর বলতে পারি না জ্যাঠামশাইকে।

বাইরে এসে কালু বলল, 'চিত্তশুদ্ধি কেমন করে হয়?'

আমরা কিছুই জানতাম না। চুপ করে থাকতাম।

পরের দিন থেকে চিত্তশুদ্ধি আশ্রম চালু হয়ে গেল। সত্যি-সত্যি বগলা এসে আশ্রমে ঢুকল। একটা ছেঁড়া গামছা, মাথায় ফলের ছোট ঝুড়ি, ডান হাতে এক পুঁটলি—বগলা বেস হাসতে হাসতে আশ্রমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

বিকেলে একবার তাকে দেখতে গেলাম। গরম কাল। কার্বোলিক সাবান মাখিয়ে জ্যাঠামশাই তাকে স্নান করিয়েছেন, নতুন একটা ধুতি আর গেঞ্জি দিয়েছেন পরতে। বগলা স্নান করে, ধুতি-গেঞ্জী পরে বিড়ি টানছিল। আমাদের দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

জ্যাঠামশাইয়ের চিত্তশুদ্ধি আশ্রমে জনা চারেক লোক সপ্তাহখানেকের মধ্যে জুটে গেল। বগলা, হাবুল, গিরিধারী আর কেষ্ট। একজন ঠগ, অন্যরা ছিঁচকে চোর, পাগল। পঞ্চাকে জ্যাঠামশাই ধরতে পারেন নি তখনও।

আমাদের বাড়িতে, পাড়ায় ততদিনে একটা হৈ-হৈ পড়ে গেছে। চোর, ছ্যাচড়, পাগল এনে-এনে জ্যাঠামশাই বাড়িতে পুরছেন, তারা দিব্যি বিনি পয়সায় দুবেলা ডাল-ভাত-তরকারি খাচ্ছে, দড়ির খাটিয়ায় তোশক পেতে ঘুম মারছে, এরপর তো এরাই পাড়ার বাড়িতে-বাড়িতে চুরি-চামারি করতে বেরুবে।

কেউ বলছে, পাড়ার মধ্যে এসব চলতে দেওয়া যায় না; কারও-কারও মত হল, থানায় গিয়ে একটা খবর দিয়ে এলে ভাল হয়। বুড়োর দলই বেশী হই-হই করতে লাগল—চুরি-চামারির ভয় ছাড়াও পাড়ার একটা ইজ্জত রয়েছে, জ্যাঠামশাই সেই ইজ্জত নষ্ট করে ছাড়লেন।

দু-পাঁচজন জ্যাঠামশাইকে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, নিষেধও করলেন। জ্যাঠামশাই কোনো পাত্তাই দিলেন না। বললেন, 'তোমরা আমার চরকায় তেল দিতে এস না। আমার বাড়িতে আমি যা খুশি করব, কারও কিছু বলার এক্তিয়ার নেই।'

পাড়ার লোক জ্যাঠামশাইয়ের ওপর চটতে লাগল। বাড়িতে জ্যাঠাইমাও রাগে গরগর করতেন। ঠাকুমা অবশ্য হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতেও দেখতাম. বাবা বেশ অসন্তুষ্ট। বলতেন, 'মহাদেবদার মাথা খারাপ হয়েছে। গাঁটের পয়সা খরচ করে কতকগুলো রাস্তার চোর-জোচ্চরকে পুষছেন। পাগল ছাড়া এমন কাজ কেউ করে না।'

চিত্তশুদ্ধি আশ্রম মাসখানেকের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। চারের জায়গায় ছয় হয়ে গেল আশ্রমের সদস্য। নতুন দুজন এল ষ্টেশনের ওপার থেকে। একজনের নাম ঝণ্টু, অন্যজনের নাম মিশির। আরও দু-একজন নাকি খাতায় নাম লিখিয়ে গেল, পরে আসবে।

আমি আর কালু জ্যাঠামশাইয়ের আশ্রমের ব্যাপ্যার-স্যাপারগুলো দেখতে যেতাম। সকালে বগলারা ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করত, মুখ ধুয়ে উঠানে গিয়ে বসত আসন করে। জ্যাঠামশাই নেমে আসতেন। জ্যাঠামশাইয়ের সামনে হাত জোড় করে বসে ওরা একটা বিদঘুটে শ্লোক আওড়াত। জ্যাঠামশাই

শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ওদের মুখের কথা কিছু বোঝা যেত না। গলার স্বরও অদ্ভুত।

এরপর থাকত বগলাদের ছোলা মুড়ি গুড়ের ব্যবস্থা। খেয়ে নিয়ে ওরা জ্যাঠামশাইয়ের কাছে অফিসঘরে এসে দাড়াত। বগলাকে জ্যাঠামশাই টাকা দিতেন, কোনোদিন পাঁচ, কোনোদিন সাত। বগলা চলে যেত বাজারে। ফল কিনে বেচাকেনা করে আবার বেলায় ফিরে আসবে। চুরিচামারি করবে না। ফিরে এসে হিসেব দিতে হবে জ্যাঠামশাইকে। বগলার পর টাকা নিত গিরিধারী। সে যাবে তিলকুট, রেওড়ি, তিলের নাড়ু বেচতে। বগলার মতন তাকেও ফিরে এসে হিসেবপত্র দিতে হবে। হাবুল আর কেষ্টর মধ্যে পালা করে একজন যেত জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাজারে, অন্যজন আশ্রমের ঘরদোর পরিষ্কার করত, পাঁড়ে ঠাকুর রান্না করতে এলে জলটল তুলে দিত। আশ্রমের রান্না হত নীচেই।

সন্ধের দিকে জ্যাঠামশাই তাঁর আশ্রমের লোকদের ধর্মকথা শোনাতেন, সৎশিক্ষা দিতেন, মন্দ কাজ করলে মানুষের কী হয় তার ফিরিস্তি শোনাতেন

মোটামুটি এইভাবেই চিত্তশুদ্ধি আশ্রম চলছিল। আশ্রমের লোকেরা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে মাসখানেকের মধ্যেই চেহারা পালটে ফেলতে লাগল। সাজ-পোষাক সকলের একরকম ছিল না। কেউ কেউ ধুতি পেয়েছিল, গেঞ্জি পেয়েছিল; কাউকে কাউকে জ্যাঠামশাই খাকি প্যান্ট আর ফতুয়া দিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা অবশ্য আশ্রমে গেলেই কার্বোলিক সাবানের গন্ধ পেতুম, কখনো দেখেছি—পাঁচড়ার মলম, নিমতেলের গন্ধ ছাড়ছে বাতাসে। কেষ্ট পাগলা মাঝে মাঝে পালিয়ে যেত আশ্রম ছেড়ে, জ্যাঠামশাই তাকে ধরে আনতে সারা শহর ঘুরে বেড়াতেন। আনতেনও ধরে।

কার কতটা চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে জানবার আগেই একদিন শুনলাম বগলা পালিয়েছে। শহর ছেড়েই উধাও। হাবুল বলল, 'বাবুর কাছে পাঁচ টাকা নিলে ও চার টাকার ফল কিনত, এক টাকা আগেই মারত। চার টাকার ফল বেচে বাবুর কাছে সাড়ে পাঁচ টাকার হিসাব দিত। আট আনা তার নামে জমত লাভ বাবদ।'

জ্যাঠামশাই কোনো কথা বললেন না। গম্ভীর হয়ে থাকলেন। বগলার জায়গায় এল অনাদি। বয়সে কম, চালাক চতুর। সুশীল কাকাদের বাড়িতে কাজ করত। নিজেই এসে জ্যাঠামশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরল। তার বড়

হাতটানের অভ্যেস। লোভ দমন করতে পারে না। তার চিত্তশুদ্ধি দরকার।
আশ্রমে অনাদির জায়গা হয়ে গেল।

বগলা পালাবার সপ্তাহখানেক পরে গিরিধারীও পালাল। অবশ্য শহর ছেড়ে চলে গেল না। ঘাপটি মেরে থাকল। আশ্রম তার পোষাচ্ছে না।

পাগলা কেষ্ট একদিন খেপে গিয়ে হাবুলের সঙ্গে এমন মারপিট করল যে, কেষ্টর কনুইয়ের জোড়টাই গেল ভেঙে। তাকে রেলের হাসপাতালে রেখে আসতে হল জ্যাঠামশাইকে। তার চিৎকার আর সহ্য হচ্ছিল না জ্যাঠাইমার।

আশ্রমে আসবে বলে যারা নাম দিয়েছিল, আগেই জ্যাঠামশাই তাদের খুঁজতে লাগলেন। কেউ আর এখন আসতে চায় না। খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া সব ফ্রি। তবু কেন যে ওরা আসতে চাইছে না, জ্যাঠামশাই বুঝতে পারলেন না।

আমাকে বললেন, 'হ্যাঁরে, কী হল বল তো? ব্যাটারা নিজেরাই বলে-আসব, এখন আমায় দেখলেই পালায়।'

আমি বললাম, 'ভয়ে।'

'ভয়ে? কিসের ভয়ে?'

'তা জানি না। এখানে এলেই নাকি দাগী হয়ে যেতে হয়।'

'দাগী?'

'তাই তো বলছিল একদিন গিরিধারী। বলছিল, জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলে যেমন দাগী চোর হয়ে যেতে হয়, এখানে থাকলেও সেই রকম হয়।'

জ্যাঠামশাই একটু ভেবেচিন্তে বললেন, 'বুঝেছি। আমার পেছনে এনিমি লেগেছে।'

এর দিন দশেক পরে একদিন সকালবেলায় জ্যাঠামশাই হন্তদন্ত হয়ে বাবার কাছে এসে বললেন, 'সত্য, আমার গালে ওই ছোঁড়াটা চড় মেরে পালিয়েছে।'

বাবা বললেন, 'সে কী! কোন ছোঁড়া চড় মারল?'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'ওই যে অনাদি। সুশীল মিত্তিরদের বাড়ি থেকে এসেছিল। ছোঁড়াটা নিজেই এসেছিল। তার কথাবার্তা হাবভাব আমার ভাল লেগেছিল। দিন কয়েক দেখেশুনে তাকে আমি বাড়ির কাজে লাগিয়েছিলাম। তোমার বউদিও দেখতাম ছোঁড়াকে পছন্দ করেছে। তখন কি জানতাম ছোঁড়ার পেটে-পেটে এত শয়তানি বুদ্ধি!'

'কী করেছে ছোঁড়াটা?' বাবা আসল কথাটা জানতে চাইলেন।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আজ সকালে উঠে বাজার যাব; দেখি আমার পকেট ঘড়িটা নেই। ও কি আজকের ঘড়ি। আমার বাবামশাই দিল্লি দরবারের সময় কিনেছিলেন। সোনা রয়েছে ওতে। দামের কথা বাদ দাও, ওটা আমার বাবার স্মৃতি। ছোঁড়াটাকে আমি এত বিশ্বাস করলাম, আর ও ও কিনা আমার ঘড়ি চুরি করে পালাল।'

বাবা বললেন, 'থানায় গিয়ে খবর দিন। আর তো কিছু করার নেই।'

জ্যাঠামশাই হায় হায় করতে করতে চলে গেলেন।

এর দিন তিনেক পরে আবার যে ঘটনাটি ঘটল সেটা আরও অদ্ভুত।

জ্যাঠামশাই রাত্রের দিকে আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে তাঁর চুরি যাওয়া ঘড়িটা দেখালেন। ঘড়ি ফেরত পেয়ে জ্যাঠামশাইয়ের যতটা খুশী হওয়া উচিত ছিল, অতটা খুশী তাঁকে দেখাচ্ছিল না।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কেমন করে পেলেন ঘড়িটা?'

জ্যাঠামশাই পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে বাবার হাতে দিলেন। বললেন, 'সুশীল আমায় খুব একটা শিক্ষা দিয়েছে।'

চিরকুটটা পড়ে বাবা হা-হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'সুশীলবাবুই তাহলে তাঁর বাড়ির চাকর অনাদিকে আপনার আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন ঘড়ি চুরি করতে।'

জ্যাঠামশাই চুপ করে থাকলেন।

বাবার হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে জ্যাঠামশাই দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলেন বাইরে। তুলে দেখি, সুশীলকাকা বড় বড় করে লিখেছেন: 'ঘড়িটা ফেরত নেবেন। আমাকে ক্ষমা করবেন। অনাদি চোর নয়। আমার কথায় চুরি করেছিল। আপনার চিত্তশুদ্ধি আশ্রমটি রাখবেন না তুলে দেবেন ভেবে দেখবেন।'

জ্যাঠামশাই শেষ পর্যন্ত তাঁর সাধের চিত্তশুদ্ধি আশ্রমটি তুলেই দিলেন।

এই
আশ্চর্য
লোকটা

[অনেক দিন আগেকার কথা, অন্তত বছর পঁয়ত্রিশ। আমার তখন পনের ষোল বছর বয়েস। ঠাকুমা আর ছোটকাকার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলাম বেড়াতে। ফেরার সময় এমন একটা কাণ্ড ঘটেছিল, যার কোন অর্থ আমরা কেউই খুঁজে পাইনি। আজও পাই না।]

কোন্ গাড়ি কি তার নাম ছিল, আজ আমার কিছু মনে নেই। দুপুর নাগাত আমরা কাশী থেকে মোগলসরাই ষ্টেশনে এসে রেলে চড়েছিলাম। তখন ওইদিককার রেলের নাম ছিল ই-আই-আর, মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল-ওয়ে। এখনকার মতন মাত্র দুটো ক্লাস ও তখন ছিল না, ছিল চারটে, ফাষ্ট, সেকেণ্ড, ইণ্টার ও থার্ড। আজকাল রেলের কামরা মানেই যেন একটা ছোট-খাটো মেলা, লোকে গিশগিশ করে। তখনকার দিনে এত ভিড়টিড় কোনো গাড়িতেই থাকত না, মেল এক্সপ্রেস গাড়িতে তো নয়ই।

আমাদের গাড়িটা বোধ হয় এক্সপ্রেস গাড়ি ছিল, কেন না সব ষ্টেশনে থামছিল না। দুপুরের শেষ দিকে গাড়িতে উঠেছি।

ইণ্টার ক্লাস কামরা। জনা ছয় মাত্র যাত্রী আমাদের কামরায়। দিন দুই পরে কালী পুজো। দুর্গাপুজোর পর গিয়েছিলাম কাশীতে। ফিরছি কালীপুজোর আগে। আসব ধানবাদ। বাবার কাছে নিজের বাড়ীতে।

সাসারাম এসে পৌঁছতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। তখন ওদিকে শীত পড়তে আরম্ভ করেছে সবে। ওসব দিকে পুজোর পরপরই শীত এসে পড়ে, হেমন্ত-কাল বুঝতে বুঝতেই কখন যেন জব্বর শীত এসে যায়। সাসারামে শের-শাহের সমাধি শুনেছি। গাড়ি যখন সাসারামে এসে পৌঁছল, তখন এত অন্ধকার যে আমার চোখে বাহিরের কিছুই ধরা পড়ল না। এমন কী ষ্টেশনটাও যেন টিমটিম করছে।

সাসারাম থেকে গাড়ি ছাড়ার সময় একজন ভদ্রলোক এসে গাড়িতে উঠলেন। গায়ে লম্বা রেলের কোট, ওভারকোট ধরণের, পরনে রেলের প্যাণ্ট। গলায় একটা রুমাল জড়ানো। মাথায় বারান্দা মার্কা রেলের টুপি। মাথায় বেশ লম্বা।

ভদ্রলোক যখন উঠলেন, গাড়িটা তখন ছাড়ছিল। উনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কামরার বাতিগুলো দপ্ করে নিভে গেল, অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার জলে উঠল।

লোকটিকে ভালো করে দেখাই যাচ্ছিল না, টুপিটা এমন করে নামান যে,

চোখের তলায় গিয়ে ঠেকেছে। সঙ্গে কোন মালপত্র নেই। ঝাড়া হাত-পা। উনি কামরায় উঠেই এদিক সেদিক তাকিয়ে সোজা বাংকে উঠে শুয়ে পড়লেন। জুতো সমেত। শুয়ে পড়ে মাথার টুপিটা এমন করে মুখে চাপা দিলেন, মনে হলো কামরার আলো যেন চোখে না লাগে, সেই ব্যবস্থা করে নিলেন। যেটুকু দেখলাম ভদ্রলোককে, বুঝতে পারলাম রেলের লোক, আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। আমার বাবা রেলের চাকুরে। ছেলেবেলা থেকে রেলের লোক দেখতে দেখতে কেমন একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে। গোমো আর ধানবাদে অজস্র অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দেখেছি যারা রেলেই কাজ করে। ভদ্রলোকের কত বয়েস তা বুঝতে পারিনি, তবে আমার ছোট কাকার চেয়ে নিশ্চয় বড়।

গাড়ি চলতে শুরু করল। একটা বেঞ্চিতে আমরা ঠাকুমা ছোটকাকা আর আমি। আর এক বেঞ্চিতে এক বেহারী ভদ্রলোক শুয়ে ছিলেন, তিনিও কাশী ফেরত, সঙ্গে প্রচুর মালপত্র। অন্য বেঞ্চিতে এক সাধুবাবা, সঙ্গে তাঁর কোন মাড়োয়ারী শিষ্য। সাধুবাবার গায়ে গেরুয়া বস্ত্র এইমাত্র, নয়ত তিনি একেবারে সাধারণ মানুষের মতন, হিন্দিতেই কথাবার্তা বলছিলেন আর বিড়ি টানছিলেন।

আমার কাকা রেলে উঠলেই ঢুলতে শুরু করেন। সন্ধ্যে হয়েছে দেখে কাকাও মাথার ওপর বাংকে চড়ে বসলেন। গাড়ি চলতে লাগল। ঠাকুমা বোধ হয় জপতপ শুরু করল মনে মনে। আমি চুপচাপ একা। বাইরে তাকালেই অন্ধকার আর অন্ধকার। মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের ধোঁয়া এসে যেন নাকে লাগছে, কয়লার গুড়ো উড়ছে, আর থেকে থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের ফুলকি জোনাকির মতন অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ছে।

এইভাবে শোন নদী পেরিয়ে গেলাম। কী বড় ব্রীজ। ট্রেন ছুটছে, ছুটতে ছুটতে গয়াও এসে গেল, তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।

গয়া থেকে গাড়ি ছাড়ল। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ। কাকা আবার বাংকে উঠে ঘুম লাগালেন। বেহারী ভদ্রলোক খাওয়া শেষ করে বড় বড় ঢেঁকুর তুলতে লাগলেন। সাধুবাবা শিষ্যসমেত গয়ায় নেমে গিয়েছেন, নূতন কেউ আর চড়ে নি।

সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক কিন্তু একই ভাবে শুয়ে আছেন। নিশ্চয়ই। ট্রেনে রেলের বহু লোকই যাতায়াত করে এক ষ্টেশন থেকে অন্য

ষ্টেশনে। কাজে-কর্মে যায়, কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরে। কাজেই ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার কোন কৌতূহল হয়নি।

গয়া আর কোডারমার মধ্যে কোডারমার আগে মস্ত জঙ্গল। নামকরা জঙ্গল। বিহারে এত বড় জঙ্গল খুবই কম, লোকে বলে গুরপা গুঝাণ্ডির জঙ্গল। দিনের বেলাতেও এই জঙ্গলের অর্দ্ধেক জায়গায় আলো রোদ ঢোকে না। রেল লাইন্ পাতার সময় এই জঙ্গলের আরও ভয়ঙ্কর রূপ ছিল। রেলের কুলি লাইনের অনেকেই নাকি বাঘটাঘের পেটে গিয়েছে। রেলের দুটো ষ্টেশনই আছে, গুরপা আর গুঝাণ্ডি। এই পাহাড়ী জায়গাটুকুর চড়াই ভাংতে বাড়তি একটা ইঞ্জিন জুড়তে হয়, একটা ইঞ্জিন গাড়ি টানতে পারে না।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না, কোডারমা থেকে গয়ার দিকে আসার সময়, না গয়া থেকে কোডারমার দিকে যাওয়ার সময় দুটো ইঞ্জিন লাগে। যখনই লাগুক তাতে এ গল্পের কোন ক্ষতি নেই। কেননা তখনকার দিনে বাড়তি ইঞ্জিনটা একবার যেমন যেত অন্যবার ফিরে আসত। আবার যেত।

ডবল ইঞ্জিন জুড়ে গাড়িটা ছাড়ল। রাতও হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলের মুখে ঢুকে বেশ শীত শীত লাগছিল। কাচের জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। গাছপালা আর অন্ধকার মিশে সে এক এমন জগৎ যা চোখে সওয়া যায় না বেশীক্ষণ। তবু গুরপা গুঝাণ্ডির আসল জঙ্গল তখনও শুরু হয়নি, তেমন নিবিড় নয় গাছপালা।

যেতে যেতে গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল। সব রেলগাড়িই মাঝে মাঝে বেজায়গায় থেমে যায়। হয় সিগনাল পায় না, না হয় অন্য কোন গোলমাল হয়। কেন যে নামে যাত্রীরা তো তা বুঝতেও পারে না।

গাড়িটা থামার পর সামান্য সময় চুপচাপ কেটে গেল। ভাবছি এই ছাড়বে। গাড়ি আর ছাড়ে না। হঠাৎ শুনি ইঞ্জিনের হুইসেল বাজছে তারস্বরে। বাজছে তো বাজছেই। বেহারী ভদ্রলোক জেগেই ছিলেন, বললেন, লাইনের ওপর নিশ্চয়ই বাঘ এসে গেছে সরছে না।

রেললাইনের ওপর বাঘ বসে থাকে, ইঞ্জিনের অত জোরালো আলোয় নড়ে না, শব্দতেও না এ আমার জানা ছিল না। আমার কাকাও দেখি বাংক থেকে নেমে এলেন।

ব্যাপারটা কি হচ্ছে বোঝার জন্য জানালা খুলে দিলাম। দেখি গার্ড সাহেব হাতের সেই সবুজ লাল লণ্ঠন্ সামনের ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

তাঁর সঙ্গে আরও দু-একজন খালাসী ধরণের লোক বোধ হয় পিছনের ইঞ্জিনের লোক। লাইনের পাশ দিয়েই যাচ্ছে সবাই।

আমাদের মতন আরও অনেকে গলা বাড়াচ্ছে কামরার মধ্যে থেকে। গাড়ির বাইরের দিকের আলো পড়ছে সামান্য, ভেতরের আলোও জানলা দিয়ে বাইরে পড়ছিল ঝাপসাভাবে।

আমার কাকা আর বেহারী ভদ্রলোক নানা রকম কথা বলতে লাগলেন। ঠাকুমা একটু শুয়েছে। সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক কিন্তু বাংকের ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। টুপিতে মখ ঢাকা। গাড়ি আর ছাড়ে না।

ঠিক যে কতক্ষণ কাটল তাও বুঝতে পারছিলাম না। শেষে দেখি গাড়ীর দরজা খুলে অনেকেই নামতে শুরু করেছে। নেমে যে যার কামরার পাদানির কাছে দাড়িয়ে। নানারকম গলা শোনা যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে কারও সাহস নেই দু পা এগিয়ে খবর কিছু জেনে আসবে। আমার কাকা দরজা খুলে নীচে নামলেন।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। কি যে হচ্ছিল তাও বুঝতে পারছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত বেশ সোরগোল পড়ে গেল। কেমন করে যেন দু-চারটে টর্চ বেরিয়ে গেল। লাইনের পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করতে লাগল কেউ কেউ। গার্ড সাহেব শেষ পর্যন্ত ফিরতে লাগলেন, লোকে খোঁজ খবর নিচ্ছে কি হল।

কাকা একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন, খবর নিয়ে ফিরে এসে শুকনো মুখে বললেন, সামনের ইঞ্জিনের ড্রাইভার মারা গিয়েছে হঠাৎ। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। ফ্যায়ার ম্যানের একজন গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে। শুনে আমি চমকে উঠলাম। বেহারী ভদ্রলোক বললেন, হায় ভগবান।

মানুষ হঠাৎ কেমন করে মারা যায়, সে বয়সে বুঝতাম না। এখন বুঝি। তখন বুঝতে পারিনি। ড্রাইভারের সেরিব্রাল ষ্ট্রোক হয়েছিল। তখন এসব রোগ-নিরোগের কথা শোনাও যেত না। আগে রেল ইঞ্জিনের মধ্যে ড্রাইভারের সঙ্গে কয়লা দেওয়া জনা দুয়েক লোক ছাড়াও একজন সাকরেদ থাকত ড্রাইভারের। এদেরই কেউ গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে। দিয়ে ঘন ঘন হুইশেল মেরে বিপদের বিষয়টা জানাচ্ছিল গার্ডকে।

এখন কি হবে? ড্রাইভার তো মারা গেল। গাড়ি চালাবে কে? আমরা কি সারারাত এই জঙ্গলে পড়ে থাকবো।

ড্রাইভার মারা গেছে এটা কোনো রকমে সব কামরায় প্রচার হয়ে পড়ল। তারপরই একটা হই-হই। বাইরে বড় কেউ নামছে না, পাদানির তলায় দাঁড়িয়ে আছে। গলা বাড়াচ্ছে সবাই। এমন সময় শোনা গেল, মৃত ড্রাইভারকে নামিয়ে ব্রেকভ্যানে তোলা হচ্ছে। ইঞ্জিনের মধ্যে তো ফেলে রাখা যায় না।

দেখতে দেখতে রাত বেড়েই চলল, আমরা অসহায়ের মতন গাড়িতে বসে আছি। ভাবছি এই জঙ্গলে এই ভাবেই সারাটা রাত কাটাতে হবে। না জানি কি হবে।

গার্ড সাহেবও বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। কতবার যে সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করলেন। তাঁরই তো যত ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা। এতগুলো যাত্রীর জীবন-মরণ যেন তাঁরই হাতে।

আরও খানিকটা পরে দেখি, গার্ড সাহেব প্রত্যেকটি কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলে দিচ্ছেন। বোধ হয় সাবধান করে দিচ্ছেন, বলছেন, যে যার কামরায় দরজা বন্ধ করে বসে থাকো, সকাল না হলে কিছু করার উপায় নেই।

আমাদের কামরার কাছে এলেন গার্ড সাহেব। আধ খোলা দরজা দিয়ে উঠলেন ভিতরে। লম্বা চওড়া চেহারা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড। বললেন, আপনাদের সারারাত গাড়িতেই থাকতে হবে। সাবধানে থাকবেন। খুবই দুঃখের কথা, সামনের ইঞ্জিনের ড্রাইভার হঠাৎ মারা গেছেন।

গার্ড সাহেব নেমে যাবার একটু পরেই দেখি বাংক থেকে সেই অ্যাংলো ভদ্রলোক নেমে এলেন। টুপি পরলেন এমন করে যে মুখটা আড়াল হয়ে গেল। ভাল করে দেখতেও পেলাম না মুখটা।

ভদ্রলোক কামরা থেকেও নেমে গেলেন। তারপর দেখি পাশের কামরা থেকে গার্ড সাহেব নামামাত্র কী সব কথাবার্তা বলছেন। সামান্য পরে দেখলাম গার্ড সাহেব আর সেই লোকটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কাকা বললেন, যে মারা গেছে তার কেউ হবে। বেহারী ভদ্রলোক বললেন, মালুম দোস্ত হবে। ঠাকুমা বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দে।

আমরা যখন দরজা বন্ধ করে, জানালার শার্সি ফেলে যে যার শোবার

ব্যবস্থা করছি তখন একেবারে আচমকা ইঞ্জিনের হুইশেল বেজে উঠল। বার তিন টানা-টানা। তার পরই গাড়ি আবার নড়ে উঠল। সবাই অবাক। কাকা বললেন, লোকটা নিশ্চয়ই ড্রাইভার। এ লাইনে হরদম রেলের কত লোক যাওয়া আসা করে। যাক্ বাবা বেঁচে গেলাম। কোডারমা তো পৌঁছই। এই জঙ্গলে সারারাত পড়ে থাকতে হলে মরে যেতুম।

বেহারী ভদ্রলোক বললেন, রামজী কী কৃপা, বাবু। গুরপা গুঝাণ্ডির জঙ্গল পেরিয়ে আমরা কোডারমা পৌঁছালাম যখন, তখন প্রায় মাঝ রাত। ষ্টেশনে গাড়ি থামল। হঠাৎ শুনি প্লাটফর্মে হই-চই। জানলা দরজা খুলে নেমে গেল অনেকে। কাকাও নেমে গেলেন।

খানিকটা পরে ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। ওই যে লোকটা আমাদের কামরা থেকে নেমে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল, সেই লোকটা যখন গাড়ি চালিয়ে আনছিল, তখন ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানরা বয়লারের আলোয় লোকটাকে পুরো দেখতে পেয়েছিল। একেবারে মরা ড্রাইভারের মুখের মতন দেখতে। সেই মরা ড্রাইভারই। গাড়ি থামতেই দুটো ফায়ারম্যান ইঞ্জিন থেকে নেমে পালিয়েছে। লোকটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না।

বেহারী ভদ্রলোক বললেন, হায় রাম, বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আমি বললুম, আর গার্ড সাহেব?

কাকা বললেন, গার্ড সাহেব ব্রেক ভ্যান খুলে ডেড্‌বডি নামাবার সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। বলছেন, মরা ড্রাইভার আর জ্যান্ত ডাইভারের কে যে সত্যি কে যে মিথ্যে, তিনি বুঝতে পারছেন না।

আমার হাত পা কাঁপছিল, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। আমি বললাম, 'তা হলে কে গাড়ি চালিয়ে আনল?'

কাকা বললেন, আমিও তো তাই ভাবছি। ভূতে তো আর গাড়ি চালিয়ে আনতে পারে না। কিন্তু ফায়ারম্যানরাই বা পালাবে কেন? লোকটাই বা কেন উধাও হবে? আশ্চর্য!

আমার মনে পড়লো, সাসারাম ষ্টেশনে লোকটা গাড়িতে ওঠামাত্র, আমাদের কামরার আলো দপ্ করে নিবে গিয়েছিল। কেন?

ম্যাজিশিয়ান

বছর পঁচিশ পরে দেখা। চিনতেও পারিনি।

অশ্বিনীই আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'কী রে, চিনতে পারছিস? আমি অশ্বিনী।'

মানুষ যে কত বদলে যায়, অশ্বিনীকে না দেখলে বোঝা মুশকিল। ছেলেবেলার চেহারা বয়েসে পালটে যায়। তবু একটা আদল ধরা পড়ে। অশ্বিনীর সবই পালটে গিয়েছে। অনেকক্ষণ নজর করে দেখলে হয়তো তার সামনের দাঁত আর কখনও-কখনও চোখের দৃষ্টিতে পুরনো অশ্বিনীকে একটু-আধটু ধরা যায়।

অশ্বিনী আমার হাত ধরে টানল। বলল, 'আয়। দোকানে আয়। আমি ধুলুর মুখে শুনেছিলাম, তুই আসছিস।'

ধুলু আমার ভাই। নিজের নয়, দূর সম্পর্কের। বয়েসে অনেক ছোট। শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপারে ধুলুদের বাড়িতেই এসেছি। দিন-দুই থাকার কথা।

দরজির দোকান দিয়েছে অশ্বিনী। বাজারের মধ্যেই। দোকানের নাম রেখেছে 'মনোরমা'। ছোট দোকান। সাধারণভাবে সাজানো গোছানো। দোকানের পেছনের দেওয়ালে কাঠের তক্তা দিয়ে বাক্স মতন করে নিয়েছে, সেখানে তার দরজি বসে সেলাই মেশিন নিয়ে।

অশ্বিনী আমাকে তার চেয়ারে বসাল। নিজে বসল একটা টুলের ওপর। বলল, 'কত কাল পরে তোকে দেখলাম, বিজন। কেমন আছিস বল?'

বলার আর কীই বা ছিল। 'চাকরি-বাকরি, ঘরসংসার, ছোটখাট অসুখ-বিসুখ নিয়ে সাধারণ মানুষ যেমন করে বেঁচে থাকে সেই ভাবেই দিন কাটছে।' বললাম অশ্বিনীকে। শেষে বললাম, 'তুই কেমন আছিস তাই বল?'

অশ্বিনী বলল, 'আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস। এই দোকান নিয়ে আছি। চলে যাচ্ছে কোনো রকমে।' বলে অশ্বিনী উঠল। 'দাঁড়া, একটু

চায়ের কথা বলে আসি। পাকৌড়া খাবি? সেই মতিয়ার দোকানের পাকৌড়া। মতিয়া অবশ্য নেই, তার ভাইপো দোকান চালায়।'

অশ্বিনীকে খুশি করতেই আমি মাথা নাড়লাম। অশ্বিনী চলে গেল।

দোকান ফাঁকা। রাত হয়ে আসছে। যদিও মাসটা ফাল্গুন, তবু কলকাতার মতন গরম পড়ে যায়নি। একটু শীতের ভাব রয়েছে।

আমার বারবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। অশ্বিনী আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে হাই স্কুল পর্যন্ত পড়েছি। খেলাধুলো করেছি একসঙ্গে। থাকতামও এক পাড়ায়।

স্কুল ছাড়বার পর থেকে আর তেমন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। আমার বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করে ধানবাদ ছাড়লেন। আমিও ছাড়লাম। মাঝে এক-আধবার দু-এক দিনের জন্যে এসেছি হয়তো ধুলুদের বাড়ি, অশ্বিনীকেও দেখেছি, কিন্তু এবার যেমন দেখলাম সে রকম নয়।

ছেলেবেলায় অশ্বিনী ছিল যেমন হুজুগে তেমনি বেপরোয়া। তার বাবা, আমাদের কামাখ্যাকাকা, ছিলেন রেলের ছোট ডাক্তার। দেখতে বড় সুন্দর ছিলেন। বড়দের সঙ্গে থিয়েটারও করতেন। অশ্বিনী অত সুন্দর ছিল না দেখতে, কিন্তু সুশ্রী ছিল। তার চোখ নাক ছিল চমৎকার চেহারাটা অবশ্য গণেশ-গণেশ ছিল। অশ্বিনী বেশ শৌখিন ছিল। ফিটফাট প্যাণ্ট শার্ট পরে স্কুলে যেত। তার পকেটে পাট করা রুমাল থাকত। আমরা তখন বাচ্চাদের পকেটে রুমাল থাকার কথা ভাবতেই পারতাম না।

অশ্বিনীর ছেলেবেলা থেকেই শখ ছিল ম্যাজিশিয়ান হবে। ধানবাদের রেলবাবুরা পেল্লায় করে যে এক্সিবিশান করতেন সেখানে গণপতির ম্যাজিক দেখার পর থেকেই তার মাথায় এই শখ চাপে। অশ্বিনী বটতলার ম্যাজিক শিক্ষার বই আনিয়ে ম্যাজিক শিখত, আর আমাদের দেখাত।

ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে অশ্বিনী অনেকবার মরতে মরতে বেঁচে গেছে। একবার সে কলা খেয়ে মুখ থেকে ছুঁচ বার করতে গিয়ে মর-মর হয়েছিল। আর একবার যা করেছিল, আরও মারাত্মক। কাচের টুকরো চিবিয়ে খেতে গিয়েছিল। বইয়ে পড়েছিল আদার রসে কাচের টুকরো ভিজিয়ে উনুনের পাশে রেখে গরম করে নিলে কাচ হজম করা যায়। সেই কায়দাটা দেখাতে গিয়ে গাল জিভ কেটে যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল অশ্বিনীর। ছেলেবেলার এইসব বোকামি সে অবশ্য শুধরে নিয়েছিল, কিন্তু ম্যাজিকের নেশা তার মাথা

থেকে যায়নি। আমরা যখন স্কুল ছেড়ে চলে আসি, তখন সে অনেক পাকা ম্যাজিশিয়ান; সরস্বতী পুজোরদিন স্কুলে সে ম্যাজিক দেখাত।

ম্যাজিশিয়ান অশ্বিনী আজ সাদামাটা একটা দরজির দোকান দিয়ে বসে আছে—এ যেন ভাবাই যায় না। তা ছাড়া তার চেহারা? সেই সুশ্রী, শৌখিন অশ্বিনীর আজ কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েছে। রোগা, হাড়-হাড় চেহারা, মুখ শুকিয়ে বুড়োদের মতন চিমসে হয়ে গিয়েছে, মুখের কথা জড়ানো, মাথার চুল পাতলা, পোষাক আশাকও একেবারে মামুলি। ওকে দেখলে দুঃখই হয়।

অশ্বিনীর কথাই ভাবছিলাম, এমন সময় অশ্বিনী ফিরে এল। হাতে শাল-পাতার ঠোঙায় পাকোড়া। বলল, 'আমি খাব না, তুই খা। গরম ভাজিয়ে আনলাম। চা আসছে।'

পাকোড়া খেতে খেতে আমি বললাম, 'তোর এই দরজির দোকান কত দিনের?'

'তা বছর ছয়েক হবে।'

'মনোরমা নাম দিয়েছিস কেন?'

'আমার মায়ের নাম মনোরমা।'

আমার খেয়াল ছিল না কাকিমার নাম। অপ্রস্তুত হলাম। তার পরই বললাম, 'তুই আর কিছু করতে পারলি না? চাকরি-বাকরি? অন্য কোনো ভালো ব্যবসা?'

'চাকরি করেছি। ভাল লাগল না। ঝগড়া-ঝাটি হত। ছেড়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু এই দরজির দোকানে তোর চলে?'

'চলে যাচ্ছে। আমার আর আছেটা কী। মা নেই, বাবা নেই। দিদি ছিল। সেও নেই। আমি একলা থাকি। নিজেই রান্নাবান্না করি খাই।'

এমন সময় চা এল। দেখলাম, অশ্বিনীর জন্যে চা আসেনি। বললাম, 'তুই চা খাবি না?'

'না। তুই খা।'

চা খেতে খেতে আমি হেসে বললাম, 'তোর সেই ম্যাজিক? ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছিস?'

অশ্বিনী আমার দিকে তাকাল। পাতা পড়ল না চোখের। একবার

যেন দৃষ্টিটা কঠিন ও রুক্ষ হল, তারপর ধীরে ধীরে সেই রুক্ষ ভাব মোলায়েম হয়ে এসে কেমন যেন মলিন হল।

অশ্বিনী বলল, 'লোক দেখানো ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছি।'

কথাটা কানে লাগল। বললাম, 'তার মানে? ম্যাজিক তো লোকেই দেখে।'

'ও ম্যাজিক আর আমি দেখাই না।'

'অন্য ম্যাজিক দেখাস নাকি?' আমি ঠাট্টা করে হাসলাম, 'সেটা আবার কী?'

অশ্বিনী ম্লান করে হাসল; কোনো জবাব দিল না কথার।

চা খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। অশ্বিনী চুপচাপ। আমার কেমন ভাল লাগছিল না। অস্বস্তি হচ্ছিল। অশ্বিনীর হঠাৎ এমন বোবা হয়ে যাওয়া কেন? সে মাঝে মাঝেই আমায় কেমন করে যেন দেখছে। তা ছাড়া এসে পর্যন্ত লক্ষ করছি, অশ্বিনী কথা বলার সময় মুখের সামনে রুমাল ধরে রাখছে। কী খারাপ অভ্যেস।

অসহিষ্ণু হয়ে আমি বললাম, 'তুই যেন কী ভাবছিস! আমায় অমন করে দেখছিস কেন?...রুমালটাই বা মুখের সামনে ধরে রেখেছিস কেন?'

অশ্বিনী রুমাল সরাল না। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল; তারপর বলল, 'তোকে একটা কথা বলতে পারি। বিশ্বাস করবি?'

'কী কথা?'

'শুনলে হাসবি। ভাববি, আমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

আমি হেসে ফেলে বললাম, 'তোর তো প্রথম থেকেই মাথার গোলমাল। ছেলেবেলায় কাঁচ চিবিয়ে খেতে গিয়ে মরতে বসেছিলি, মনে নেই!'

অশ্বিনী হাসির মুখ করল।

আমি বললাম, 'তোকে কত বছর পরে দেখছি, অশ্বিনী। আমার ভাল লাগছে না। এই দরজির দোকান, তোর চেহারা, চোখ মুখ সব যেন কেমন লাগছে। সত্যি করে বল তো, তোর কী হয়েছে? আমি হাসব না।'

অশ্বিনী বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নিশ্বাস ফেলল বড় করে। তারপর বলল, 'তোকে যা বলছি সত্যি, করেই বলছি। এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। মিথ্যে বলছি না।' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অশ্বিনী বলল, 'বছর আটেক আগের কথা। মা বেঁচে আছে। বাবা নেই। তখন আমি একটা

চাকরি করতাম। তবে চাকরিতে আমার মন ছিল না। মন ছিল ম্যাজিকে। ম্যাজিকই ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান। কত টাকা পয়সাই না খরচ করেছি ম্যাজিকের জিনিসপত্র তৈরি করতে, সাজপোশাক বানাতে। ছোটখাট একটা দলই তৈরি করে ফেলেছিলাম আমি। এ-সব দিকে—মানে তোর কোলি-য়ারিতে, মেলায়, রেলের ক্লাবে, চ্যারিটি শোয়ে আমার ডাক পড়ত। দলবল নিয়ে যেতাম। খেলা দেখাতাম। টাকা পয়সাও পেতাম। একবার কাতরাস-গড়ে আমাদের ডাক পড়ল। কালীপুজোর সময়। খেলা দেখাতে গেলাম দলবল নিয়ে। সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল, তুই চিনবি না, ভজনদার মেয়ে। তার নাম ছিল টুনি। দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি স্মার্ট। টুনিকে নিয়ে আমরা দু-তিনটে খেলা দেখাতাম। তার মধ্যে একটা ছিল হাসি-হুল্লোড়ের, বড় বেতের টুকরির মধ্যে টুনিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হত—আর চোখের পলকে ভ্যানিশ হয়ে যেত টুনি, তার বদলে টুকরি থেকে এক জোড়া খরগোশ বেরিয়ে আসত।'

অশ্বিনী কথা বলতে বলতে থামল একবার। বাইরের দিকে তাকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'অন্য দুটো খেলার মধ্যে একটা ছিল, টুনি ছুরি দিয়ে আমার জিব কেটে দেবে, রক্ত পড়বে গলগল করে, আবার কাটা জিব জোড়া হয়ে যাবে। সোজা খেলা। তুইও ছেলেবেলায় স্কুলে যাবার সময় রাস্তার ধারে এই খেলা দেখেছিস—মাদারিরা দেখাত। খেলাটাকে চটকদার করার জন্যে আমি টুনির মতন বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে খেলাটা দেখাতাম। তাকে খুব ভাল করে খেলাটা শিখিয়েছিলাম। ···সেদিন কিন্তু কী যে হল কে জানে! সহজ খেলা। অজস্রবার দেখিয়েছি। অথচ ওই দিনটাতে সব গোলমাল হয়ে গেল, ভুল হয়ে গেল আমাদের। টুনি আমার আসল জিবে ছুরি চালিয়ে দিল।'

আমি চমকে উঠলাম। বলে কী অশ্বিনী! ওর জিব নেই নাকি? তা হলে কথা বলছে কেমন করে?

আমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী বলল, 'তুই ভাবছিস, আমার জিব কি কেটে ফেলেছিল টুনি? না। সবটা কাটেনি। জিবের একটা পাশ কেটে গিয়েছিল; তাতেই যা রক্ত পড়েছিল তুই কল্পনাও করতে পারবি না। হাসপাতালেও ছিলাম বেশ কিছুদিন।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'সেই থেকে ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছিস?'

মাথা হেলিয়ে অশ্বিনী বলল, 'হ্যাঁ ; ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো তোকে বলিনি এখনও। আমার জিব ধীরে ধীরে আবার আগের মতন হয়ে এল খানিকটা, ভাবলাম বেঁচে গেলাম। পরে দেখলাম, জিবটা আগের মতন আর হচ্ছে না। রঙটা দিন দিন কালো হয়ে যাচ্ছে, আর ধারগুলো কেমন গুটিয়ে থাকে। কথা বলতে আগে বেশ কষ্ট হত। এখন অনেকটা সামলে নিয়েছি।'

কৌতূহল বোধ করে বললাম, 'দেখি তোর জিব ?'

অশ্বিনী মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, 'দেখা না কী হয়েছে ?'

অশ্বিনী আমার চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'না রে, দেখিস না।'

'কেন ?'

'আমার জিব কাউকেই আমি দেখাই না। মা আমার জিব দেখত, মারা গেল। বাজারের দাস ডাক্তার আমার জিব দেখেছিল—সেও মারা গেল। আমার জিব দেখলে খারাপ হয়। আমি কারুর সামনে জিব দেখাই না।'

আমার বিশ্বাস হল না।

তারপরই মনে পড়ল, অশ্বিনী আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আগাগোড়া মুখের সামনে রুমাল আড়াল করে রেখেছিল। সে কোনো কিছুই খায়নি।

অশ্বিনীর কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না, আবার কেমন ভয়ও করছিল। অশ্বিনী কার জিব নিয়ে বেঁচে আছে কে জানে। তার, না, অভিশপ্ত কোনো জীবের, কে জানে।

আগন্তুক

অফিসে আমার ফোন-টোন বড় আসে না। ছোট অফিস। চার পাঁচটা মাত্র ঘর। ফোন বলতে মাত্র দুটি। একটা থাকে ডক্টর দাশগুপ্তর ঘরে, অন্যটা আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট বিরামবাবুর টেবিলে। সেদিন শনিবার, অফিস বন্ধ হবার সময় হয়ে এসেছে এমন সময় ফোন এল আমার।

বিরামবাবু ডাকলেন। 'তোমার ফোন রজত।'

উঠে গিয়ে ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে নন্তুদার গলা। নন্তুদা আমার পিসতুতো ভাই। আমার প্রায় সমবয়সী, মাস আষ্টেকের বড়। যদিও দাদা বলি, তবুও আমার খুব বন্ধু।

নন্তুদা ফোনে বলল, 'তোর ছুটি হয়ে গেছে?'

'না, হব-হব করছে।'

'ছুটি হলে সোজা এখানে চলে আয়।'

'কেন, যাচ্ছ নাকি কোথাও? সিনেমা? টিকিট কেটেছ?'

'হাঁ। তাড়াতাড়ি আসবি।'

'হাউসটা বলে দাও না, আবার তোমার ওখানে ছুটব!'

'হাউস! ....ম্যাড্ হাউস .....!'

'অ্যাঁ—!'

'এখানে আয়। তাড়াতাড়ি।' নন্তুদা ফোন রেখে দিল।

ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। অবাক হলাম।

নন্তুদা এক সময়ে চাকরি বাকরি করত। ছেড়ে দিয়েছে। ফোটো তোলায় তার বরাবর সখ ছিল, নেশা ছিল। তুলতে তুলতে হাত বেশ পাকা হয়ে যায়। বার কয় প্রাইজও পেয়েছে তার ফোটোর জন্যে। নামটাম হয়ে যাবার পর নন্তুদা চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে ওয়েলেসলির কাছে এক ফোটোর দোকান দেয়। তার কিছু চেনাজানা খদ্দের আছে, তারা নন্তুদার দোকান ছাড়া অন্য কোথাও যায় না। একটা ফোটো তোলার দোকান চালিয়ে যে

যথেষ্ট আয় হয় নন্তুদার তা নয় ; তবে বাড়িতে কোনো দায় দায়িত্ব নেই। পিসেমশাইয়ের ভাল আয়। নন্তুদার মাথার ওপর সন্তুদা, কাজেই স্টুডিও খুলে বসে থেকে দিব্যি চলে যাচ্ছে ওর।

আমার অফিস ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে। হেঁটে হেঁটেই চলে যাওয়া যায় নন্তুদার স্টুডিওতে। ছুটির পর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। কলকাতায় সবেই বর্ষা নেমেছে। বৃষ্টি যে তেমন হচ্ছে তা নয়, তবে মেঘলা ভাবটা থাকছে সারাদিনই, দু এক পশলা হালকা বৃষ্টিও হচ্ছিল।

হুস করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আমি নন্তুদার স্টুডিও দিকে পা বাড়ালাম। রাস্তার জল নেই, কাদা কাদা ভাব রয়েছে।

নন্তুদা যে কেন ডেকে পাঠাল বুঝতে পারছিলাম না। সিনেমায় না হোক কোথাও বেড়াতে যাবে নাকি। নন্তুদার এক বড়লোক বন্ধু আছে—মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে এসে উঠিয়ে নিয়ে যায় নন্তুদাকে। ব্যারাকপুর, বেহালা, বারাসাত—যেখানে হোক বেড়াতে চলে যায়।

নন্তুদার দোকান মোটামুটি সাজানো-গোছানো। সামনেটায় 'বসবার জায়গা, খদ্দের এসে বসে। আশেপাশে, ফোটোর দোকান যেমন হয়, শো-কেসের আড়ালে নন্তুদার তোলা ভাল ভাল কয়েকটা ফোটো। ফোটো তোলা ফিল্মের বড়সড় এক বিজ্ঞাপন একপাশে। এইরকম নানা জিনিস। বসার জন্যে একটা চেয়ার, বড় সোফা। দোকানের পেছন দিকে নন্তুদার ফোটো তোলার স্টুডিও, তারই পাশে খুপরি মতন বন্ধ এক ঘরে ফিল্ম ধোওয়ার ব্যবস্থা।

দোকানে পৌঁছে দেখি নন্তুদা কতকগুলো খুচরো কাজ সারছে। মুখ তুলে বলল 'তোর অফিসে ফোন পাওয়ার কি ঝামেলা রে!'

বসতে বসতে বললাম, 'লাইনটা গণ্ডগোল করছে ক'দিন। তারপর খবর কি বলো? হঠাৎ ডাকলে?'

'খবর বলব বলেই তো ডাকলাম। বস, চা খা। বলছি। বাইরে আকাশ কেমন?

'নিজেই তো দেখতে পাচ্ছ।'

'ঢালবে মনে হচ্ছে?'

'মেঘলা বেশ। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।'

হাতের কাজ সেরে নন্তুদা দোকানের বাইরে মুখ বাড়িয়ে অন্যদিকে

ডাকল। অনাদি পাশাপাশি দুটো দোকানে কাজ করে, ফাই ফরমাস খাটে, দোকান পরিষ্কার করে।

অনাদিকে চা আর ওমলেট আনতে বলে নন্তুদা চেয়ারে বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'তোকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার শোনাব। শুধু শোনাব না, একজনকে দেখাব…।'

'আমি ভাবলাম তুমি সিনেমা-টিনেমা দেখাবে; না হয় বেড়াতে নিয়ে যাবে কোথাও!'

'সিনেমা তো তুচ্ছ রে! ব্যাপারটা যদি শুনিস…।'

'বলো শুনি।' আমার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না শোনার। শনিবারের বিকেলটা বরবাদ হল। কোথাও গিয়ে কিছু একটা দেখলে হত। কপালে নেই।

নন্তুদা বলল 'আজ হল তোর শনিবার। গত সোমবার এক ভদ্রলোক আমার দোকানে এসেছিলেন ছবি তোলাতে। এই দিককার লোক। নাম বললেন, এস, ডলবি। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। বয়েস মন্দ না, ধর—পঞ্চাশের ওপর। মাথায় ভীষণ লম্বা, ছ'ফুটের ওপর, রোগাসোগা দেখতে। তা ভাই, আমি ওঁর ফোটো তুলে—বুধবার আসতে বললাম প্রিণ্টটা নিয়ে যাবার জন্যে। এখন হল কি, মঙ্গলবার যখন ডেভেলাপ করতে বসলাম, ও হরি, একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। ফিল্মে কিছুই আসে নি। বার তিনেক নিয়েছিলাম। একবারও ছবি এল না। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না। আজকাল ফিল্মের কোয়ালিটি খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ লোকটার আগে পরে সব ঠিক আছে, মাঝখান থেকে খারাপ হল কেমন করে? কিছুই আমার মাথায় এল না।… বুধবার সন্ধের দিকে ডলবি এল তার ছবি নিতে। মিথ্যে কথাই বলতে হল। বললাম, সাহেব,—ডেভেলাপ করার সময় আমার একটু গাফিলতি ঘটে গেছে। তখন কট করে লোডশেডিং হয়ে গেল। নেগেটিভ সামলাতে পারি নি। তুমি দয়া করে আজ আর একবার বসো, আমি ফোটো তুলে নিচ্ছি। তা সাহেব কোনো আপত্তি করল না, রাগারাগিও করল না. স্টুডিওর মধ্যে বসল চেয়ারে। আমি যত্ন করে আবার তুললাম।……সেই নেগেটিভের কি অবস্থা হয়েছে দেখবি?

আমার খানিকটা কৌতূহলই হচ্ছিল। বললাম, 'দেখি।'

নন্তুদা উঠল। উঠে তার 'ডার্করুমে' চলে গেল। ফিরে এল সামান্য পরে, হাতে ফিল্মের রোল বলল, 'এই দেখ।'

চোখের সামনে নন্তুদা যেটা মেলে ধরে দেখাল, তাতে আমার কিছু চোখে পড়ল না প্রথমে। তারপর ভালকরে নজর করতে দেখলাম, ধোঁয়ার মতন কিছু যেন ফুটে রয়েছে। একেবারেই অস্পষ্ট। মানুষের মুখ চোখের কোনো আদল কোথাও নেই।

'আমার কিছু নজরে আসছে না।' আমি বললাম, 'ধোঁয়ার মতন একটু কী দেখছি।' নন্তুদা বলল, 'ঠিকই দেখছিস। এবারেও ওঠেনি।'

'এটা তা হলে কী?'

'ভগবান জানেন।'

'দু দু'বার তুমি ছবি তুলতে পারলে না?'

'কোথায় আর পারলুম! আমার প্রফেসানাল লাইফে এরকম আর হয়নি। ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

'ফিল্মের দোষ?'

'না। ফিল্মের নয়। ক্যামেরার নয়।'

'তা হলে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

আমি বেশ অবাক হয়ে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ, তারপর বললাম, 'তা তুমি আমায় ডেকে আনলে কেন। আমি ফটোর ব্যাপার কিছু বুঝি না।'

নন্তুদা বলল, 'তোকে ডাকলাম অন্য কারণে। সেই সাহেব আজ আবার আসবে। তার ছবি নিতে। তুই একবার চোখে দেখতো তাকে। একজন জলজ্যান্ত মানুষের ছবি উঠল না দু দু'বার। ব্যাপারটা কী। লোকটা কি মানুষ নয়। ভূত! না, ওর কোনো ট্রিক আছে?...লোকটাকে দেখাবার জন্যে তোকে ডাকলাম।'

অনাদি চা ওমলেট নিয়ে এল।

আমরা ওমলেট খেতে খেতে কথা বলতে লাগলাম।

'কখন আসবে তোমার সেই সাহেব?'

'সন্ধের আগেই।'

'সে তো অনেক দেরী।'

'কোথায় আর!'

'আমি না হয় ঘুরে আসি খানিকটা।'

'কোথায় যাবি ঘুরতে। বৃষ্টি বাদলার দিন, রাস্তাঘাটের যা অবস্থা।' অগত্যা বসে থাকতে হল নন্তুদার দোকানে।

বৃষ্টিটা আবার এক পশলা হল। জোরেই। থেমেও গেল। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করে পড়ছিল, চলেও যাচ্ছিল। মেঘলার দরুণ ছ'টা বাজার অনেক আগেই ঝাপ্সা হয়ে গেল।

নন্তুদার সঙ্গে গল্পে গল্পে সময় কেটে গেল। সন্ধে হয়ে আসছে দেখে আমি বললাম, 'এবার তা হলে তোমার সেই সাহেব আসবে?'

'হ্যাঁ; এই সময়েই আসবে।'

ছ'টা বেজে গেল। রাস্তার দোকানে পশারে বাতি জ্বলে উঠেছে অনেকক্ষণ। বৃষ্টির সেই একই অবস্থা, আবার টিপ টিপ করে জল পড়ে চলেছে। বাড়ি ফেরার সময় হয়ত ভিজতে হবে। ভাবছিলাম, আর খানিকটা বসে উঠে পড়ব। এমন সময় লম্বা গোছের একজন দোকানে ঢুকল।

নন্তুদা কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারলাম, ডলবি সাহেব।

এই রকম মানুষ আমার আগে কখনও চোখে পড়েনি। মাথায় খুবই লম্বা। সোয়া ছ'ফুটের কম নয়। রোগা টিঙ টিঙ করছে। মুখটাও লম্বা ধাঁচের চোয়ালের হাড় ফুটে আছে, যেন মুখ বলতে ওই হাড়ই, লম্বা নাক, হাড়ের ওপর চামড়া লাগানোর মতন দেখায়, চোখ দুটো গভীর গর্তে ঢোকানো, কপালে অজস্র দাগ। মাথায় চুল প্রায় নেই। নেড়া নেড়া দেখায়। মানুষ-টাকে দেখলে মনে হয়, রোগে রোগে শেষ হয়ে গিয়েছে, মুখটুখ একেবারে মোমের মতন সাদা দেখতে, চোখের জমিটা হলুদ, দাঁত নোঙরা। সাহেবের পরনে প্যান্ট, বেশ পুরোনো. গায়ে বে-মাপের কোট। গলায় একটা রুমাল জড়ানো।

নন্তুদা ডলবি সাহেবকে দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

সাহেব হিন্দী আর ভাঙা ইংরেজী মিলিয়ে যা বলল, তার মানে দাঁড়ায়, এই জল বৃষ্টির মধ্যে তাকে আসতে হল বাধ্য হয়েই, ফটোর জন্যে।

নন্তুদা ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বলল, সাহেবের ছবি সে তুলতে পারে নি, আবার নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সাহেব যে প্রচণ্ড রেগে গেল তা নয়, তবে খুশী হল না। বিড়বিড় করে

আপন মনে কিছু বলল। বলে আর দাঁড়াল না, দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

নন্তুদা বলল, 'দেখলি?'

'দেখলাম। একেবারে স্কেলিটন দেখতে, কিন্তু মানুষ তো।'

'আমিও তো তাই বলছি। মানুষই, ভূত নয়। কিন্তু ওর ফটো কেন আসছে না?'

কেন আসছে না আমার জানার কথা নয়। চুপ করেই থাকলাম।

আর খানিকটা পরে বললাম, 'আমি তা হলে এবার যাই। তোমার দেরী আছে।'

'না না, আর একটু বোস। একসঙ্গেই যাব।'

কেন যে ডলবির ফটো উঠল না তাই নিয়ে নানান রকম গবেষণা করতে লাগল নন্তুদা। আমি চুপচাপ শুনে যেতে লাগলাম।

সাতটা বাজল। উসখুস করছিলাম আমি।

নন্তুদা দোকান বন্ধ করার তোড় জোড় শুরু করল।

আমরা প্রায় উঠব, এমন সময় এক বুড়ী দোকানে ঢুকল। অ্যাংলো বুড়ী। পোশাক আশাক কেমন ময়লা পুরোনো।

বুড়ী দোকানে ঢুকে একটা ছাতা একপাশে রাখল।

নন্তুদা বলল, 'কেয়া মাঙ্তা?'

বুড়ীর হাতে প্লাসটিকের ছোট্ট হ্যাণ্ডব্যাগ। ব্যাগ খুলে একটা কার্ড এগিয়ে দিল নন্তুদার দিকে।

নন্তুদা বুড়ীর দিকে তাকাল 'হ্যাঁ, হামারা কার্ড।'

বুড়ী বলল, 'ফটো দেও। হামারা লেড়কাকা।'

'কোন লেড়কা?'

'কার্ড দেখো।'

নন্তুদা আবার কার্ডটা দেখল। তারপর বলল, 'ডলবি?'

মাথা নাড়ল বুড়ী। 'হ্যাঁ।'

নন্তুদা আমার দিকে তাকাল। ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছে যেন। তারপর বুড়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, ফটো নেই হ্যায়। খারাপ হো গিয়া হ্যায়।'

বুড়ী কেমন অবাক হয়ে নন্তুদার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'খারাপ হো গিয়া হ্যায়! মাই গড্।'

বুড়ী আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে কেঁদে ফেলল।

নন্তুদা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ভলবি আয়া থা।'

'কব ?'

'আজ ভি আয়া থা। থোড়া আগাড়ি।'

বুড়ী কান্না থামিয়ে বলল, 'ঝুট মাত বলো।'

নন্তুদা বোকার মতন তাকিয়ে থাকল বুড়ীর দিকে।

বুড়ী আবার বলল, 'ঝুট বাত বোলনা নেহি চাহিয়ে।'

'ঝুট নেহি। সাচ বাত।'

বুড়ী ভীষণ চটে গেল। তারপর শাসাবার ভঙ্গিতে বলল, 'বাবু তুম খারাপ আদমি। বহুৎ খারাপ। হামরা লেড়কা মর গিয়া হ্যায়। তুম তামাশা লাগাতে হো!

নন্তুদা চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। তারপর বুড়ীর দিকে। 'মর গিয়া হ্যায় ? কব ?'

'কাল।'

নন্তুদা মাথা নাড়ল জোরে। বলল, 'নেহি। কভি নেহি।'

বুড়ী বিড়বিড় করে কি বলতে ছাতা হাতে করে রাস্তায় নেমে গেল।

নন্তুদা আমার দিকে তাকাল। 'কী বলে রে, মরে গেছে! মরা মানুষ দোকানে আসে কেমন করে ?'

আমি বোকার মতন বললাম, 'মরার আগে তোমার কাছে এসেছিল, মরার পরও। আশ্চর্য।'

নন্তুদা বলল, 'বুড়ীর মাথা খারাপ। ওর ছেলে বেঁচে আছে।'

আমি বললাম। 'তা তো স্বচক্ষেই দেখলাম। কিন্তু বাঁচা মানুষের ফটো কেন উঠল না সেটাই বুঝতে পারলাম না।'

নন্তুদা কোন জবাব দিল না।

ভূত নিয়ে ছেলে খেলা

ভূত নিয়ে ছেলে খেলা করা উচিত নয়। আমার ছোট মামার ব্যাপার দেখেই সেটা বুঝে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা আজকের নয়, বছর তিরিশ আগেকার।

আমার ছোটমামা পাণ্ডবেশ্বরের দিকে একটা ছোটখাটো কোলিয়ারীতে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন। নতুন জায়গায় আস্তানা গেড়েই তিনি আমাদের চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলেন, আমি ভূত ধরতে শিখেছি। পত্রপাঠ চলে আয়, এখানে যে কী সব জিনিস রয়েছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবি না। যে বাড়িটায় আমি থাকি—তার ঘরে ঘরে ভূত, ছাদে ভূত, দেওয়ালে ভূত, বারান্দায় ভূত, নিমগাছে ভূত। এক একটা এক এক টাইপের কেউ সন্ধেবেলায় এসে চা খায়। কারও বা সিগারেট পেশা, কেউ গাইয়ে—বড় দরের, কালোয়াতী গায়, কেউ বা তবলা বাজায়। ডু নট মেক ডিলে। তুরন্ত আ যাও।

ছোট মামা খুবই রগুড়ে লোক। হই হই ছাড়া থাকতে পারেন না। মাথায় নানারকম ফন্দি খেলে। খাসা চেহারা। রান্না-বান্নাও করতে পারেন দারুণ। মুর্গি স্পেশ্যালিষ্ট। আবার ভূতের ব্যাপারে প্রচুর খোঁজ খবর রাখেন। ছোটমামার চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাবার উপায় ছিল না। পড়াশোনার একটা ঝামেলা ছিল। মামাকে লিখলাম, আমরা বড় দিনের ছুটিতে আসছি। আমি, রতন আর কালুদা। তুমি ভূতগুলোকে একটু ভজিয়ে ভাজিয়ে কয়েকটা দিন রেখে দাও। আমরা ওদের দেখতে চাই।

ছোট মামা জবাবে লিখলেন, ওরা বলছে, বেশি শীত পড়ে গেলে থাকতে পারবে না। কোলিয়ারীর শীতে ওদের কষ্ট হয় খুব। তখন গরম জায়গায় চলে যায়। মাস দুই আড়াই শীত কাটিয়ে ফিরে আসে।

বুঝতে পারলাম, মামার আর তর সইছে না।

বড় দিনের ছুটি পড়ার দিন-দুই-চার আগেই আমরা ছোটমামার কোলিয়ারীতে গিয়ে হাজির। রতন আমার খুড়তুতো ভাই, আর কালুদা পাশের বাড়ির দাদা, প্রায় আত্মীয়ের মতন।

ছোটমামা আমাদের পেয়ে বেজায় খুশী। বললেন, 'তোরা একেবারে জাস্ট টাইমে চলে এসেছিস। ওরা বাইশে ডিসেম্বর চলে যাবে।'

'ওরা মানে তোমার ভূতরা?'

'আমার নয় রে, আমার নয়। ওরা হল, গুড়সাহেবের আমলের। তার মানে তোর বিহার আর্থকোয়েকের সমঝকার।'

কালুদা বলল, বিহার আর্থকোয়েক, ওরে বাব্বা—তখন তো আমি ইজেরও পরতাম না শুনেছি।'

রতন বলল, 'গুড়সাহেব কে ছিলেন, মামা?'

'ম্যানেজার। ওর বাংলোর নাম হয়েছিল ভূত বাংলো।'

'তুমি কি সেই বাংলোয় থাকো?'

'না না, সে-বাংলো এখন ভেঙে ফেলা হয়েছে। কিছু ভূত পালিয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে গিয়েছিল। তাদের ছেলেপুলেরা আবার এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। কয়েকটা আমার কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ে বসে আছে।' বলে মামা হাসলেন রগুড়ে হাসি।

কালুদা বলল, 'ভালই করেছে। অমোদের সঙ্গে দেখা শোনা হবে।'

আমরা মামার কোয়ার্টারে এসে দেখলাম, বাড়িটা পুরোনো, গোটা তিনেক ঘর, দেওয়াল টেওয়াল স্যাঁৎ সেঁতে, কাটাকুটিও কম নেই। টিকটিকির আড্ডা দেওয়ালগুলোয়। বারান্দা আছে সামনে। পেছনে মস্ত চাতাল। বাগানে হরেক রকম বাংলা গাছ।

দুপুরটা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে কাটল। বিকেলে কাছাকাছি একটু বেড়ানো গেল। সন্ধের আগেই মামা কোলিয়ারী থেকে ফিরে এলেন। এসেই বললেন, 'আজই তোরা ভূত দেখবি? না, মুর্গি ওড়াব? মুর্গি কিন্তু এখনও জোটে নি।'

মামার কাজের লোক অনাথ। কানে ভাল শুনতে পায় না। রান্নাবান্নার হাত মন্দ নয়। রাত্রে আমাদের রুটি আর মুর্গির মাংস ওড়ানোর কথা। মামা নিজেই রান্নায় বসবেন, কিন্তু মুর্গি পাওয়া যায় নি আজ। আমরা বললাম, 'তুমি আজ অনাথকেই ছেড়ে দাও, কাল পরশু বরং তোমার রান্না খাওয়া

যাবে। আজ আমাদের ভূত দেখাও।' মামা বললেন, 'ঠিক আছে। চা-টা খেয়ে নে ভাল করে। আমিও রেডি হয়ে নিই।'

তৈরী হয়ে বসতে বসতে সন্ধে ঘন হল। ফাঁকা জায়গা নদীও কাছাকাছি। শীতটাও জব্বর পড়েছে। বসার ঘরে কোলিয়ারী-মার্কা ফায়ার প্লেস—মানে উত্তর দেওয়ালের দিকে একটা খাঁজ কাটা গর্ত। সেখানে কয়লার পাঁজা থেকে কিছু কয়লার চাঁই উঠিয়ে এনে রাখা হয়েছে। কয়লার চাঁইগুলো নিবে যায় নি। নিবু নিবু হয়ে এসেছে। ঘরটা তাতেই মোটামুটি গরম হয়ে এসেছিল।

দরজা-টরজা বন্ধ করে দিয়ে মামা বসলেন। মামার গায়ে একটা ঢাউস আলখাল্লা, গরম কাপড়ের। জানালাও বন্ধ। মামার হাতে একটা লোহা বসানো সরু ছড়ি ছিল। আর কাচের গ্লাস। কালুদার হাতে ছড়িটা দিলেন তিনি, কাঁচের গ্লাসটা রতনের হাতে। আমায় বললেন, 'তুই আর আমি হাতে হাত ছুঁয়ে বসে থাকব। খবরদার হাত ওঠাবি না। নে—সব কাছাকাছি আয়। কালু, তুমি আমাদের কাউকে টাচ করবে না। রতন তুইও কাউকে ছুঁবি না।'

আমরা মামার কথা মতন গোল হয়ে বসলাম। মামা আমার মুখোমুখি। আমরা কাছাকাছি, ঝুঁকে পড়ে পরস্পরের হাত ছুঁতে হবে। আমাদের দু পাশে রতন আর কালুদা। তারা সামান্য তফাতে।

মামা বাতি নিবিয়ে দিয়েছিলেন আগেই। ফায়ার প্লেস থেকে কয়লার একটু আভা আসছিলো।

মামা বললেন, 'এটা প্লানচেটও নয়, সার্কেল নয়। একে বলে মিনিস্ট্রি। কেন বলে জানি না…যাকগে, এবার সব চোখ বন্ধ করো। কথা বলবে না। ঘরের মধ্যে যাই হোক, চোখের পাতাটি কেউ খুলো না। খুললেই বিপদ। আর শোনো হে ভাগ্নেরা, একেবারে অধৈর্য হবে না। ভূতরা আমাদের পোষা কুকুর বেড়াল নয়—যে ডাকলেই আসবে। আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা এইভাবে বসে থাকতে হতে পারে বুঝলে।'

বুঝলাম। আমার আর মামার সামনে কাঠের টিপয়। আমরা টিপয়ের ওপর হাত রেখে, পরস্পরের আঙুল ছুঁয়ে বসে আছি।

'তা হলে এবার শুরু করা যাক, 'মামা বললেন, 'ওয়ান, টু, থ্রি…, চোখ বন্ধ করো।' আমরা চোখ বন্ধ করলাম।

কয়েক মিনিট কাটল। কোনো সাড়া শব্দ নেই।

আরও সময় কাটল খানিকক্ষণ। ঘর অন্ধকার। কয়লার আভাও ফিকে হয়ে আসছিল। রতন একবার তাকাল। কালুদা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

আমরা বসে আছি তো বসেই আছি। দশ, পনেরো, ত্রিশ মিনিট। বোধ হয় আধ ঘণ্টাও কেটে গেল।

তারপর আর কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলেও বোঝা গেলো কয়লাগুলোও একেবারে নিবে গেছে। ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার ঘরে।

হঠাৎ একটা শব্দ হল।

ইঁদুর-টিদুর নাকি ?

একটু পরে আবার। খুট খুট শব্দ।

কথা বলা বারণ, কাজেই ঠোঁট বুজে থাকলাম।

এবার আরও সামান্য জোরে শব্দ হল। যেন কালুদার হাতের ছড়িটা—যার তলার দিকে লোহা লাগানো—সেটা ঠক ঠক করে ঠুকছে কালুদা।

মামার গলা শোনা গেল হঠাৎ! বেশ গম্ভীর গলা। 'কেউ কি এসে৻

ঠক ঠক শব্দ হল বার তিনেক।

'খুব খুশি হলাম' 'মামা বললেন, 'কে এসেছে ?'

প্রথমে সাড়া শব্দ নেই। মামা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এসেছে ? নাম কী ?'

এবার জবাব এল। ভাঙা গলা, কর্কশ!' মদন পক্ষিরাজ!'

আচমকা একটা নতুন গলা শুনে চমকে গেলাম। আমরা তো মাত্র চার জন, আরও একজন এলো কোথা থেকে! মামা সত্যি সত্যি ভূত নামালেন ? বেশ ভয় ভয় করছে!

'কোথায় থাকা হয় ? এ বাড়িতে ?' মামার গলা।

'আজ্ঞে! বিশ বছর আছি।'

'বি-শ বছর! তা আমি এসে পর্যন্ত তোমার তো কোনো সাড়া পাই নি, বাপু ? ছিলে কোথায় ?'

আবার একটু চুপচাপ। তারপর পক্ষিরাজ বেশ রাগের গলায় বলল, 'সাড়া দিয়ে লাভ কি, বাবু। এখানে যত বকাটে নচ্ছার ছোঁড়া-ভূতের আমদানি হয়েছে। আমি বুড়ো মানুষ, এদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি না। একপাশে পড়ে আছি।'

'ও, আচ্ছা! তা সেই একপাশটা কোথায় বাবা পক্ষিরাজ ?'

'ভাঙা গ্যারেজ ঘরে, বাবু!'

'আজকে হঠাৎ এলে যে?'

সামান্য চুপচাপ থেকে পঙ্খিরাজ বলল, 'গরজে পড়ে এলাম, মশায়!··· আপনি বাড়ির মালিক, আপনাকে ছাড়া কাকে বলব! এখানে আমার ওপর কী অন্যায়টাই হচ্ছে, স্যার! এক পাশে পড়ে থেকেও রক্ষে নেই। সারাক্ষণ আমার পেছনে লেগে আছে···।'

'কারা লাগছে?'

'আপনার পেয়ারের ছোঁড়া ভূতগুলো। আপনি মশায় কতক্ষণ আর বাড়িতে থাকেন, ওই ছোঁড়াগুলো কী দাপান দাপায় সারাদিন সে খবর রাখেন? বেটারা যা খুশি করে বেড়ায়, খায় দায়, ফুর্তিফার্তা করে, রেডিয়ো বাজায়, আপনার বিছানায় শুয়ে তাস খেলে···। তা মরুক গে যাক ওরা! ক'দিন ধরে আমায় স্যার বড় হেনস্থা করছে।'

'তাই নাকি? কী করছে?'

'বলব স্যার? নির্ভয়ে বলব?'

'বলো।'

'আমায় আর তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। রোজ গিয়ে ঝামেলা করছে। বলছে, ভাগো হিঁয়াসে—নয়ত টেংরি লে লেয়গা! বিশ্বাস করুন স্যার, আমার ডান পায়ে বিরাট গোদ, কলাগাছের মতন, আমার নড়াচড়ার ক্ষমতা কম, বড় কষ্ট হয় স্যার, ওদের হাতে পায়ে ধরেছি, বাবা বাছা করেছি, কিন্তু কানে তোলে না।···আমার একটা স্বত্ব তো জমে গেছে স্যার, বিশ বছর আছি। আমায় ওরা কেন তাড়িয়ে দেবে?'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ওরা তোমায় কেন তাড়াতে চাইছে, পঙ্খিরাজ।'

'ওদের ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে আসবে?'

'কোন্ ইয়ার বন্ধুদের?'

'আছে স্যার। একটা থাকে তিন নম্বরে, সেটা বাঁশি বাজায়, আর একটা থাকে পাম্প ঘরে, সেটা চোর।'

'তা হলে তার এখানে আসা কেন? ওরা তো থাকার জায়গা পেয়েছে।'

'সে কথা কে শুনছে বলুন। ইয়ার বন্ধু জুটলে ওদের মজা আরও জমে স্যার। আপনাকে মাটির মানুষ পেয়েছে বেটারা—তাই যা খুশি করে নিচ্ছে। হতো ভাদুড়ি সাহেবের মতন কড়া মানুষ ছোঁড়াগুলোর পেজোমি ভেঙে দিত।···

আপনি স্যার ভাদুড়িসাহেবকে দেখেন নি, উনি ভীষণ কড়া ছিলেন। ঘরে দোরে কাউকে থাকতে দিতেন না!'

'না আমি অত কড়া নই। তা থাক গে পঙ্খিরাজ, তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো। তোমায় কেউ তাড়াবে না।'

'আচ্ছা স্যার, চলি তা হলে স্যার?'

'এসো।'

পঙ্খিরাজ চলে যাবার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

হঠাৎ কাঁচ ভাঙার শব্দ হল। আমরা চমকে উঠলাম।

মামা হো হো করে হাসতে লাগলেন। কিছুই বুঝলাম না হাসির অর্থ।

মামা নিজেই উঠে ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিলেন।

বাতি জ্বালার পর দেখলাম, রতনের হাত থেকে কাঁচের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেছে। আর আমার সামনে টীপয়ের ওপর দুটো দস্তানা। একটা কাঁচের গ্লাস। দস্তানা দুটো কাপড়ের। শক্ত।

মামা আমায় বললেন, 'তুই ভাবছিলি আমার হাতে হাত ছুঁইয়ে আছিস? ...আমার হাত কোথ থেকে ছুঁবি! ওই তুলো ভরা দস্তানা দুটো কেমন হাত সাফাই করে তোর আঙুলে ছুঁইয়ে দিয়েছিলাম। তুই কি বোকা রে? ধরতে পারলি না?

কালুদা বলল, 'পঙ্খিরাজ কোথ থেকে এল?'

মামা ইশারায় টেবিলের ওপর রাখা কাঁচের গ্লাসটা দেখালেন। বললেন, 'আমি ওই গ্লাসটার সামনে ধরে পঙ্খিরাজের গলা বার করছিলাম। একে বলে ভেনট্রিলোক্যুইজ্‌ম্। মানে অন্য লোকের গলা নকল করে কথা বলা। আমি এটা বেশ প্র্যাকটিস করে ফেলেছি। তোরা নেহাতই বোকা। মদন পঙ্খি-রাজ কি অত সাজিয়ে কথা বলতে পারে। বুঝলি না?'

আমি কালুদার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি লাঠি দিয়ে ঠুক ঠুক করে ছিলে।'

কালুদা মাথা নাড়ল। 'না, আমি শব্দ করিনি।'

মামা হাসতে হাসতে তাঁর আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট ছড়ি বার করলেন। ছড়ির মাথায় লোহার টুপি। বললেন, 'আমি করেছি।'

রগড়টা মন্দ না। মামা শিখেছেন বেশ। একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। রতন হঠাৎ বলল, 'ভূত এসেছিল।'

আমরা ওর দিকে তাকালাম। রতনের মুখটা অন্য রকম। বেশ পেয়েছে। 'দেখলি নাকি।' মামা ঠাট্টা করে বললেন।

আমার হাতের গ্লাসটা গরম হয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। শেষে মনে হল কেউ ফুটন্ত জল গ্লাসের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে। হাত থেকে পড়ে গেল।'

আমরা বিশ্বাস করলাম না। মামা বললেন, 'ভয়ে তোর ওই রকম মনে হচ্ছে। কাচের গ্লাস গরম হবে কেন?'

রতন কিন্তু মাটির দিকেই তাকিয়ে থাকল, কাঁচের ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে।

মামা বললেন, 'দেখছিস কী?'

রতন জবাব দিল না। না দিয়ে ঝুঁকে পড়ে একটা কাঁচের টুকরো কুড়োতে গেল। কুড়িয়ে নিয়েই ফেলে দিল চিৎকার করে। যেন তার হাত পুড়ে গেছে।

আমরা অবাক। হল কি রতনের!

মামা নিজেই এগিয়ে এসে কুঁজো হয়ে কাঁচের টুকরো কুড়োতে গেলেন। পারলেন না। হাতে নিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ফুঁ দিতে লাগলেন আঙুলে তাঁর মুখের চেহারাটাই পালটে গেল।

কালুদা আর আমিও সাবধানে কাঁচের টুকরো ছুঁতে গেলাম। ছোঁয়ামাত্র বুঝলাম, কাঁচের টুকরোগুলো যেন জ্বলন্ত কয়লার মতন তপ্ত।

আমরা চার জনে কেমন বোকা, বিমূঢ় হয়ে কাঁচের টুকরোগুলো দেখছিলাম। কিছুতেই মাথায় আসছিল না, কেমন করে এটা হয়?

কোনো সন্দেহ নেই, আমরা চার জনেই বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।